শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসচূড়ামণি
শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

[চতুর্থ খণ্ড]

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

(চতুর্থ খণ্ড)

প্রবক্তা

অনন্তশ্রীবিভূষিত যতিরাজ-রাজেশ্বর

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসচূড়ামণি

শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সভাপতি-আচার্য্য ও সেবাইত

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের

কৃপানির্দ্দেশে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ

কর্তৃক

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

হইতে প্রকাশিত।

অনুবাদক ঃ

ডঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী, এম্ এ, পি. এইচ্. ডি., (উৎকল), এম্. এ, (সংস্কৃত), এম্. এ. (সাংবাদিকতা, কলিকাতা), কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাংখ্য-বেদান্ত-সাহিত্য-শাস্ত্রী (ঢাকা), অবসর প্রাপ্ত ও. ই. এস., অধ্যক্ষ, ডাইরেক্টর, জগন্নাথ রিসার্চ সেণ্টার, উড়িষ্যা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ—

শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব ব্যাসপূজা-তিথি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষ

বঙ্গাব্দ ১৩৯৮, ইং ৩১।১০।১৯৯১

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, পোঃ—নবদ্বীপ
জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন—৭৪১৩০২, ফোন—নবদ্বীপ-৮৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ
(রেজিঃ)
৪৮৭, দমদম পার্ক (৩নং পুকুরের নিকট)
কলিকাতা-৭০০০৫৫, ফোন-৫৯-৫১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌরবাটসাহী,
পুরী, পিন—৭৫২০০১
উড়িষ্যা। ফোন—৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালী, চিড়িয়ামোড়
উঃ ২৪ পরগণা।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
অটলবন, পরিক্রমা মার্গ
পোঃ—বৃন্দাবন, মথুরা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১৫ গ্লাডিং রোড
মেনর পার্ক, লণ্ডন।

দেবাশীষ প্রেস, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

অবতরণিকা

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

চিরগৌড়জনাশ্রয় জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন,—ভূরি ভূরি পূণ্যকর্ম্মময় বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরাট অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন ক'রেও যদি ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন না হয় তবে সে সমস্তই বৃথা পণ্ডশ্রম হয়ে যায়। তিনি মায়া-যবণিকাচ্ছন্ন অন্ধজীবের বন্ধ দরজা খোলার বা চৈতন্যলাভের জন্য আরও রূঢ়ভাবে আঘাত দিয়ে বলেছেন যে, "মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তাহলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।" ভাষাটা তাঁর হলেও কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোকটীরই প্রতিধ্বনি। যা আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেব-গোস্বামী মহারাজের প্রায় প্রতিটি বক্তৃতার মধ্যেই জীবন্ত প্রত্যক্ষ করি। তাঁর শ্রীমুখে হরিকথা শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হত যেন শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর বিমলপ্রবাহে প্রভাতসূর্য্যের কিরণচ্ছটা পড়েছে। দশদিক সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শ্রীল-গুরু-মহারাজের ভাষণগুলি, যার মাধ্যমে সুকৃতিমান ভাগ্যবান জীব ক্রমান্বয়ে লোহা, তামা, পিতল, রূপা, স্বর্ণ ও চিন্তামণি প্রাপ্তির ন্যায় অথবা চিন্ময় জগতের ভিসা পেয়ে অচিন্ত্যনীয় গতিতে পরমার্থ-জগতের চরমসীমায় উন্নীত হয়ে, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ সুন্দরগণের অপ্রাকৃত ভাব-সেবা-সম্পদের অধিকারী হতে পারেন। হৃদয়গ্রন্থীভেদকারী বদ্ধজীবের সর্ব্বসংশয়ছেদি এবং সাধুগণের হৃৎকর্ণ-রসায়ন সেই ভাষণগুলি আজ বৃহৎমৃদঙ্গ বা প্রিন্টিংপ্রেসের মাধ্যমে তাঁরই প্রিয় সেবকগণের দ্বারা সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী, জার্ম্মান্‌, ফরাসী, ইতালিয়ান, ডাচ, হাঙ্গেরিয়ান ও

স্পেনিশ্ প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়ে বহুল প্রচারিত হওয়ায় আমাদের আনন্দের পরিসীমা নাই। সংঘাতপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের প্রান্তদেশে এসে চাওয়া-পাওয়ার পরিসমাপ্তি যে এত সুন্দর পরমার্থ-সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠ্‌বে তা কে জান্‌তো ? প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যিনি মূর্ত্ত-হরিকীর্ত্তনবিগ্রহ, আর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যিনি বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরানুচর বলে নিজের পরিচয় দিলেও শ্রীল প্রভুপাদ যাঁকে "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ" কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ের দিব্য ধারাধর জগদ্‌গুরু বলে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অহৈতুকী করুণার কথা আর কি বলব ! তাঁর অতিমর্ত্ত্য বার্দ্ধক্য-লীলাতেও নিরন্তর হরিকথা প্রচারের যে উৎসাহময়ী দিব্য যৌবনচ্ছটা দেখেছি সেই উদ্ভাসিত কৃষ্ণচেতনার আলোকেই তো আজ ভূমণ্ডল সমুদ্ভাসিত, সমুদ্বুদ্ধ। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে 'অচিন্ত্য' শব্দটী যেন আমাদের মত অপগণ্ডদের চৈতন্যোৎপাদনের জন্যই এতকাল অপেক্ষা করেছিল। আজ দেশে দেশে তুমুল হরিকীর্ত্তনের মহান্ যজ্ঞাগ্নি ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। এখন 'নিতাই-চৈতন্য' নাম, নিতাই-চৈতন্যের করুণাগাথা মহাবদান্যতার কথা বিপুল হরিধ্বনি সহযোগেই সর্ব্বত্র পরম-শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্ত্তিত হচ্ছে। এখন সারা পৃথিবী মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে "ভূরিদা" "ভূরিদা" বলে আলিঙ্গন দিয়ে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন না করে থাকতে পারেন নাই—কেন ? না—তিনি তপ্তজীবনের একমাত্র শান্তিবারি শ্রবণ-মঙ্গল কৃষ্ণকথামৃত গান করে মহাপ্রভুকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তাই আজ যতই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীল গুরু-মহারাজের টেপ্‌রেকর্ডারে গৃহীত স্বরূপোদ্বোধনকারী ভাষণ বা কথোপকথনগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে দেখি ততই হৃদয় পরমানন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। নিজেকে ধন্যাতিধন্য বলে মনে হয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থটী "সারমন্‌স্ অফ্ দি গার্ডিয়ান্ অফ্ ডিভোসন" চতুর্থ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

ইংরাজী হতে বাংলায় অনুবাদ করা অনেকেরই পক্ষে সহজ কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজের ভাব ও ভাষার অনুসরণে অনুবাদ মর্ম্মজ্ঞ ছাড়া অন্যের

পক্ষে অসম্ভব। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে যিনি দীর্ঘদিন শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্যের ন্যায় স্নেহ-সঙ্গ লাভ করেছেন এবং আমাকে আজও তাঁর অকৃত্রিম স্নেহপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন, আমাদের পরমবান্ধব সেই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-প্রবর, বিবিধ ভাষাভিজ্ঞ ডক্টর দোলগোবিন্দ শাস্ত্রীজী এই গ্রন্থের সানন্দে বঙ্গানুবাদ করে বঙ্গভাষাভাষী শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের ও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার আমাদের পরম স্নেহশীল সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হয়ে শ্রীগুরু-পূজার-অঞ্জলি রূপে ভক্তগণের শ্রীহস্তে সমর্পিত হয়েছে। শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁকে আরও কৃপা-সমৃদ্ধ করে সম্প্রদায়-সেবায় গাঢ়ভাবে নিযুক্ত করুন—এই প্রার্থনা। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশের ফলে ছোটখাট ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে, তজ্জন্য সজ্জনগণের কাছে ক্ষমা ও সদুপদেশ প্রার্থনা করি।

পরিশেষে শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের আস্বাদনীয় ও অনুভববেদ্য এই গ্রন্থরাজ তাঁর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-প্রভায় দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করতে করতে নিত্যকাল গৃহে গৃহে পরম কল্যাণ বিতরণ করতে থাকুন—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-সুন্দরগণের শ্রীচরণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকিঙ্কর
শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাব তিথি **ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ**
ইং ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯১।

বিষয়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

শ্রীভগবান বলেন, আমার সেবক আমার মতই পূজ্য, সে আমারই সেবা করে, তাই আমাকে যেভাবে ভক্তি ও পূজা করা দরকার, তাঁকেও সেই ভাবে ভক্তি ও পূজা করতে হবে। আমার ভক্ত আমা থেকে আলাদা নয়, সে আমার অতি ঘনিষ্ঠ। সে আমার নিজ জন, আমার পরিবারের একজন, আমার ঘরের লোক। আর আমার যারা নিজের লোক, তাঁরা পবিত্রেরও পবিত্র, আর তাঁরা সারা জগৎটাকে পবিত্র করে থাকেন। পবিত্র হওয়া মানে কেবল নিজের অহংভাব ছেড়ে দেওয়া নয়, প্রকৃত পবিত্র মানেই হচ্ছে, আত্ম-নিবেদন। তাঁরা সেবায় কোন হিসেব নিকেশ করেন না, কোন স্বার্থও তাতে নাই; কোন হেতুও নাই; তা স্বাভাবিক সেবা, সুন্দরের সেবা, প্রেমের সেবা। কেবল শক্তি বা সামর্থ্যের সেবা নয়। ইহা সৌন্দর্য্যের—প্রেমের, 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম্'।

এ জগতের পরিভাষায় 'সুন্দরম' এই শব্দটির মত এত চমৎকার শব্দ আর নাই। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীভাগবত এই সুন্দরের কথাই প্রচার করেছেন। এই 'সুন্দরম্' কেবলমাত্র নিত্য-সত্য কেবল পূজার বস্তু নয়, এ কেবল জড়ের মধ্যে চৈতন্য মাত্র নয়, এ 'সুন্দরম্' পরিপূর্ণ চৈতন্য সত্বার স্বরূপ। এই বাস্তব পূর্ণতম স্বরূপের কথা কেবল শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগত জনের দ্বারাই প্রকটিত হয়েছেন। আমরা যে সুন্দরের উপাসক, তা বাস্তব পরতত্ত্ব, সৌন্দর্য ও প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ। সেই পরতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের যোগযুক্ত হতে হবে, এবং সেই অন্তরের যোগ-সূত্রের জন্যে আমাদের সাধুগুরুর আনুগত্যে সাধনা করতে হবে, এ সাধনা একটা বিশেষ ধরণের সাধনা আর তাই আমরা অনুসরণ করব। শাস্ত্রত' আছেই, আর তার সঙ্গে জীবন্ত শাস্ত্র অর্থাৎ সাধুরা আছেন, আর তাঁদেরই আনুগত্যে আমরা জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সাধনা করে যাব। 'Die to live', বাঁচার জন্যই মরতে হবে, অর্থাৎ এই জড় জীবনের বিনিময়ে নিত্য জীবন লাভ করতে হবে।

এ জগতে যত কিছু পন্থা আছে, সে সব গুলোতেই কেবল ঋণই বেড়ে চলে। এমনিতে আমরা এ জগতে কেবল ঋণের বোঝাই বহন করে

চলেছি, আর তাকে লাঘব করার জন্য আর যারা যত কিছু পথ দেখিয়েছেন, তাতে বোঝাত' লাঘব হয়ই না বরং বেড়েই চলেছে। এ জগতের উপদেশ গুলোত' এরকমই। এখানে কোন কাজই পুরোমাত্রায় ভাল নয়। এ জগতের সৎকর্ম তাও অপবিত্র, একেবারে বাজে, কিন্তু কেবল সৎ শাস্ত্র এবং সাধুরাই বলে দেন কোনটা প্রকৃত ভাল আর কোনটা মন্দ। তাঁদের কথা মত আমরা মন্দটাকে ছেড়ে ভালটাকে গ্রহণ করব।

পূর্বে মহাপ্রভু এই কথা বলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর এযুগে আমাদের গুরুমহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অবতীর্ণ হয়ে একাই তথাকথিত ধর্ম মতবাদের, অপপন্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। বেদ বলেন, ধর্মের নামে অনেক অধর্মের কথা ও চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, এত অজ্ঞ মানুষকে বঞ্চনা, কেবল প্রতারণা। প্রকৃত ধর্ম কি ? বেদের প্রকৃত নির্দিষ্ট পন্থা কি ? তা আমাদের জানতে হবে এবং তা কেবল শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে। বেদ হচ্ছে বাঞ্ছা-কল্পতরু। সেই কল্পতরুর সুপক্ক রসাল ফল হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য ; তাতে এমন কোন কথাই নাই যাতে যে কোন ভাষ্যকার নিজের মত চালিয়ে দিয়ে বলে দেবেন এইটাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত। শ্রীমদ্ভাগবত বেদ বা উপনিষদের মত বা সিদ্ধান্তের অধীন নয়, যদিও তা বেদকল্পতরুরই স্বাভাবিক ফল।

যে ব্যক্তি অন্যের মত সহ্য করতে পারে না, সে ত' মৎসর। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত নির্মৎসর সাধুগণের সেব্য। নির্মৎসর সাধুগণই অনুভব করতে পারেন যে, পরতত্ত্ব কেবল একটিই এবং তাই-ই সর্বোচ্চ পরতত্ত্ব। তিনি স্বেচ্ছাময়, সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই আছে। তিনি মারতেও পারেন, উদ্ধারও করতে পারেন। যাঁরা নির্মৎসর, প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁরাই কেবল সেই ভূমিকায় যেতে পারেন। মৎসর ব্যক্তিরাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ঈশ্বরই যে এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, একথা তারা স্বীকারই করে না।

ঈশ্বরের সেই চিন্ময় লোকে যদি আমরা প্রবেশ করতে পারি, তবে আমরা সেখানে নিজেকে দিয়েই প্রকৃত সুখ পাবো, কিছু নেওয়ার বুদ্ধি থাকলে তা পাওয়া যাবে না।

আমরা তাঁর জন্য যদি ত্যাগ করতে পারি, তা হলে আমরা প্রকৃত সুখত' পাবোই, আর তা পূর্ণ রূপে পাবো। সে ভূমিকায় পৌঁছাতে পারলে আমরা কেবল সুখের সাগরে, আনন্দের সাগরে, অমৃতের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারবো।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের উপদেশে বিদেশ থেকে কত লোক আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। কত যুবক-যুবতী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর, শ্রীমদ্ ভাগবতের এবং ভক্তগণের প্রচারে অভিভূত হয়ে, উল্লসিত হয়ে এসেছে। এঁরা যে আসবে, একথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় একশ বৎসর পূর্বেই বলে গিয়েছিলেন এবং আমাদের গুরুমহারাজ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই কাজ আরম্ভ মাত্র করেছিলেন। তার পরে তাঁরই শিষ্য শ্রীপাদ এ, সি, ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ প্রায় শূন্য হস্তেই পশ্চিম যাত্রা করলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তিনি সেই সকল উপদেশ পশ্চিমের জনসাধারণের কাছে খুব দক্ষতার সহিত পৌঁছে দিতে সফল হয়েছেন। সেই উপদেশামৃত বিতরণের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শত শত ব্যক্তি গৌড়ীয় মঠ, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন গোষ্ঠীতে যোগদান করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা সকলেই তাঁদেরকে আপনাদের সঙ্গে একত্র দেখে খুবই উল্লসিত হয়েছেন। তাঁরা নিজের যথাসাধ্য শক্তি সামর্থ্য দিয়ে, যাবতীয় বাধার সম্মুখীন হয়েও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। বহু কৃতবিদ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমাজের সব স্তরের ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর কোণে কোণে মহাপ্রভুর বাণী পৌঁছে দিতে খুবই চাতুর্য্য প্রদর্শন করছেন। তাঁদের এই মহৎপ্রচেষ্টার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে তাঁদের উপস্থিতিতে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তাঁদের এই প্রচেষ্টা ও আগ্রহ দেখে আমরাও যথেষ্ট উৎসাহ ও বল পেয়েছি। তাঁদের অনুসন্ধিৎসার অন্ত নাই। কি এমন বস্তু এখানে আছে, যাতে এত অধিক সংখ্যক উন্নত স্তরের বিদেশী ভক্ত আকৃষ্ট হয়েছেন ? নিশ্চয়ই কিছু আছে যা জানা দরকার। এই ভাবে অনেক উচ্চপদবীর অধিকারী ভারতীয়গণ ও এসে যোগদান করছেন।

তাই সেই সমস্ত সজ্জন গণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং গুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রার্থনা করি, তাঁদের এই সাধু উদ্যম সফল হোক।

—×—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

"শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর-উদ্‌গীতকীর্ত্তির্জয়শ্রীং
বিভ্রৎ-সংভাতি গঙ্গাতটনিকটনবদ্বীপ-কোলাদ্রিরাজে।
যত্র শ্রীগৌর-সারস্বত-মতনিরতা গৌরগাথা গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগশ্রী-কৃতমতি-গুরুগৌরাঙ্গ-রাধাজিতাশা"

—শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামিপাদ

যে পরম রমণীয় দিব্য-আশ্রমে শ্রীগৌর-সরস্বতীর মতানুরক্ত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ নিত্যকাল সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরগণের প্রেমসেবন তৎপরতায় আশাবন্ধ-হৃদয়ে অফুরন্ত মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেম-সম্পদের ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের পরমানুগত্যে নিরন্তর মহাবদান্য অবতারী ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, দিব্যচিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামে পতিতপাবনী ভগবতী ভাগীরথীর মনোরম তটনিকটবর্ত্তী গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন কোলদ্বীপে দেদীপ্যমান এই মঠরাজবর্য্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, তাঁহার ক্রমবিবর্দ্ধমান্ উদ্‌গীত কীর্ত্তির উড্ডীয়মান বিজয়-বৈজয়ন্তীর সুশীতল স্নিগ্ধছায়ায় নিখিলচরাচর বিস্মাপিত করিয়া জয়শ্রী ধারণ পূর্ব্বক নিত্য বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সেবিত
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

বর্ত্তমান আচার্য্য-সভাপতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্‌ভাগবতের অধিবেশন চতুষ্টয়

প্রশ্ন ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের শুরুতেই দেখা যায়, সূত গোস্বামীই নৈমিষারণ্যে ঘটনাগুলি ঋষিদের শোনাচ্ছেন এবং তার পূর্বে ব্যাসদেব শুকদেবকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেছিলেন। সুতরাং নৈমিষারণ্যের ঘটনা ব্যাসদেব কি করে জানলেন ?

শ্রীল গুরু মহারাজ ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনেকগুলি অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমে শ্রীনারদ এসে দশটি শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটা সূচনা মাত্র দিয়ে ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, "এর উপর ধ্যান কর এবং জন-সমাজকে বিতরণ কর, একে বিস্তার কর, তা না হলে এযাবৎ তুমি যা সব দিয়েছ, সে সবই বৃথা হয়ে যাবে।" তাই ব্যাসদেব ঐ দশটি শ্লোক নিয়ে ধ্যান করে সংক্ষেপে মূল ভাগবত রচনা করেন। তিনি জানালেন, "এইটিই সর্বোচ্চ পরতত্ত্ব—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্, এবং তাঁর লীলাই সবচেয়ে মধুর। সে সব লীলা মায়িক জগতের কোন কিছুই নয়; সে ভূমিকা কেবল অপ্রাকৃত মধুরলীলায় পরিপূর্ণ।" শ্রীব্যাসদেব তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেবকে ডেকে আনলেন এবং বদরিকাশ্রমে তাঁকে শিক্ষা দিলেন। তাই শুকদেব নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, "যদিও আমি বাল্যকাল থেকে পার্থিব আকর্ষণ মুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মেই পরিনিষ্ঠিত ছিলাম, যা আমাকে প্রথমেই আকর্ষণ করে, সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-গাঁথাই আমার পিতা ব্যাসদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর লীলা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আজ আমি এই সভায় সেই কথাই বলব।"

সুতরাং শুকদেব ব্যাসদেবের কাছ থেকেই শ্রীমদ্‌ভাগবত পেয়েছিলেন। তার পূর্বেই শ্রীনারদ তাকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে বিস্তার করে শুকদেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এইটিই হল শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন। আর যখন শুকদেব শুকরতলায় ঋষিদের সভায় নিজের অভিমত সমেত শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করলেন, সেইটিই হল তৃতীয় অধিবেশন।

আর শুকদেব যখন ঐ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে সূত গোস্বামী নামে একজন বিশেষ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন 'শ্রুতিধর' ঋষি ছিলেন। যে ব্যক্তি একটিবার মাত্র শুনেই হুবহু মনে রাখতে পারে, তাকেই শ্রুতিধর বলা হয়। আর ঐ রকম গুণবিশিষ্ট সূত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ অধিবেশন হয়েছিল নৈমিষারণ্যে, যেখানে ঋষিগণ কলিযুগের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কা করে সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে সূত গোস্বামীকে দেখে তাঁরা বললেন, "আমাদের অপরাহ্নকালে ভগবানের কথা শুনবার জন্য যথেষ্ট অবসর আছে এবং আমরা শুনেছি, যে মহতী সভায় শ্রীশুকদেব ভাগবত ব্যাখ্যা করেছিলেন, আপনিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আরও জানি, আপনি সে সমস্ত কথাই স্মরণ রেখেছেন। আপনি এখন কৃপা করে ঐ ভাগবত কথা আমাদের শ্রবণ করান, এই আমাদের প্রার্থনা।" সূত গোস্বামী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং প্রত্যহ অপরাহ্নে ভাগবতের বিষয় আলোচনা করলেন। এইটিই হল শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ অধিবেশন। প্রায় ষাট্ হাজারের মত ঋষি, যাজ্ঞিক এবং পণ্ডিত সেখানে সমবেত হয়ে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। এই চতুর্থ অধিবেশনের পরেই শ্রীব্যাসদেব আবার ঐ চারটি অধিবেশনের বিবরণ সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ ভাগবতকে গ্রন্থাকারে সম্পাদন করে জগতে বিতরণ করেন।

প্রশ্ন ঃ একটু আগে আপনি ঐ যে 'শুকরতলা' নামটি বললেন, তার এখনকার পরিচয় জানতে চাই।

শ্রীল মহারাজ ঃ 'শুকরতলা' উত্তর প্রদেশের একটি ছোট জেলা, বিভুকুটীর বিপরীত দিকে গঙ্গানদীর পরপার থেকে একটু দূরে। পরীক্ষিত মহারাজ যখন জানলেন যে তাঁর মৃত্যু সাত দিনের মধ্যে নিশ্চিত, তখন তিনি গঙ্গাতীরে ঐ স্থানটিতে প্রায়োপবেশন করলেন। সেইখানেই শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল। সম্ভবত শুকদেবের নাম থেকে ঐ স্থানের নাম 'শুকরতলা' হয়েছে এবং ঐ নামেই তা এখনও প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ সূত গোস্বামী যখন নৈমিষারণ্যে ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন কি ব্যাসদেব ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন ?

শ্রীল গুরু মহারাজ ঃ না তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ; কিন্তু

তিনি সে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ত' একজন যোগী, কাজেই কখন কোথায় কি ঘটছে, তা তিনি সবই ইচ্ছা করলেই দিব্য চক্ষুতে দেখতে পেতেন এবং জানতে পারতেন। এই ভাবেই ত' মহাভারতের সমগ্র যুদ্ধ বিবরণ তিনি বর্ণন করেছেন। এটা কি করে সম্ভব? কেবল তাই নয়—তিনি এত উচ্চস্তরের সিদ্ধযোগী ছিলেন যে তিনি তাঁর যৌগিক শক্তি সঞ্জয়ের মধ্যে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন যাতে করে সঞ্জয়ও ঐ শক্তির সাহায্যে সব ঘটনাই অনুভব ও দর্শন করেছিলেন। তিনি ত' যুগপৎ কে কাকে কি বলছে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করছে সে সবই দেখেছেন এবং তা আবার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেছেন। এ কেবল ব্যাসদেবের কৃপাতেই সম্ভব। তেমনি ব্যাসদেব নিজেই যুগপৎ সবই তাঁর যোগবিভূতি দ্বারা দেখতে পারতেন।

এক সময় একজন ভদ্রব্যক্তি আমাকে বলছিলেন, আইনষ্টাইনকে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি এখন কি উদ্‌ভাবন করবার চেষ্টায় আছ?" আইনষ্টাইন উত্তরে বলেছিলেন, "আমি যদি এই রিসার্চে সফল হতে পারি, তবে আমি যেখানে থাকি না কেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে, আমার স্পর্শও অনুভব করতে পারবে। সেই ভূমিকার অনুসন্ধান আমি করছি।" উক্ত ভদ্রব্যক্তির কথার মত আইনষ্টাইনের এইটাই ছিল শেষ চেষ্টা। তবে তা কতদূর সত্য তা আমি বলতে পারব না।

অনেক ভক্ত এমন একটি স্তরে পৌঁছাতে পেরেছেন, যাতে তাঁরা একটা যায়গায় থেকে বৃন্দাবনে কোন একটি মন্দিরে এক সময় কুকুর ঢুকে যাচ্ছে তা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললেন—"ও ওখানে কুকুর ঢুকছে।" যখন চেতনায় কোন মালিন্য নাই, খুব স্বচ্ছ, কোনও অন্য চিন্তা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, তখন অন্য কোথাকার ঘটনার তরঙ্গ যদি সেই চেতনাতন্ত্রীতে আঘাত করে, তবে তিনি ওখানে কি ঘটল তা অনুভব করে ব্যক্ত করতে পারেন।

সাধকের স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে দূরস্থিত ঘটনার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। তাই তাঁরা এক স্থানে বসেও দূরের কোন ঘটনার বিবরণ বলতে পারেন। বিভিন্ন স্থানে যা কিছু ঘটে, তা তরঙ্গমাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল স্বচ্ছচিত্ত ভক্তগণ ইচ্ছা করলে সেই তরঙ্গ যখন তাঁর চিত্তফলকে

প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তিনি মানস নেত্রে ঐ ঘটনা দেখতে পান এবং তা বলে দিতে পারেন।

কিন্তু এ একপ্রকার সিদ্ধি, বিভূতি বা occult power, প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্ত ঐ প্রকার সিদ্ধি চান না, এড়িয়ে চলেন। তবে কোন কোন সময় তা আপনা আপনি এসে যায় এবং বাইরে অপরের নিকট প্রকাশও পেয়ে যায়। তবে ভক্তরা ঐ সব ভেল্‌কি দেখাতে চান না। আসলে তাঁরা মূল কেন্দ্রের রহস্য ভেদ করতে চান, তাঁরা রহস্যেরও রহস্য আবিষ্কার করতে চান, ঐ জন্য ঐ ছোট ছোট রহস্যগুলোকে আদর করেন না। তাঁরা ত' মূল সমস্যার সমাধানে সাধনারত; তাঁদের পুরো সময়টাই, পুরো সামর্থ্যটাই কেবল সেই মূল সমস্যাতেই কেন্দ্রীভূত; তাঁদের ঐ আজে-বাজে সমস্যার জন্য মাথাব্যথা থাকতেই পারে না।

প্রশ্ন ঃ শ্রীল মহারাজ! যখন শুকদেবকে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন ত' সেই সভায় তাঁর পিতা ও গুরু শ্রীব্যাসদেব, পরম গুরু শ্রীনারদ উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি কি করে তাঁদের সামনে নিঃসঙ্কোচে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যাসাসনে বসতে পারলেন ?

শ্রীল মহারাজ ঃ তখন ত' শুকদেবকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলার জন্য অনুরোধ করা হয় নাই। কেবল শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন, "যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তার কর্তব্য কি ? আমি আমার শক্তি কি-ভাবে কাজে লাগাব যাতে তা আমার মৃত্যুর পরেও আমাকে সাহায্য করতে পারে ? মরণ ত' আমার নিশ্চিত হয়েই আছে। তাই এখন সবচেয়ে কোন্ মহৎ কাজে আমার সময় দেওয়া উচিত ?"

ঐ সভায় বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের কতই না বড় বড় আচার্য্য ও ঋষি ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নানারকমের পন্থার কথা বললেন। কিন্তু তাতে পরীক্ষিত মহারাজ আরও বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "আপনারা একমত হয়ে যা হয় একটা নির্দ্দিষ্ট পথই দেখান, আমার ত' সময় খুবই অল্প।" ঠিক সেই মুহূর্তেই শুকদেব যদৃচ্ছা ক্রমে সেখানে এসে পড়লেন। তিনি ত' এ যাবৎ রূপকথার লোকই ছিলেন, সকলেই তাঁর নাম

শুনেছেন, তাঁর অপ্রাকৃত সিদ্ধির কথাও শুনেছেন; কিন্তু কেউই তাঁকে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই। তিনি ষোল বৎসর বয়সের এক বালক মাত্র। কিন্তু যে জগৎটা আমাদের কাছে এত চমৎকার, তাঁর কাছে তার কোন আকর্ষণই নাই। এই জগতের আপাত রমনীয়তার মোহ মায়া আমরা শত চেষ্টা করেও কাটাতে পারি না। কিন্তু ঐ ষোলবৎসরের বালক শুকদেব ঐ দুরন্ত মায়াকেও জয় করেছেন এবং সর্বদাই সেই নিত্য চৈতন্য সত্তায় তন্ময়। তিনি জড় জগতের বিষয়ের প্রতি এতই উদাসীন যে তিনি লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্রেরও প্রয়োজন বোধ করতেন না; এমন কি নারী-পুরুষের ভেদ জ্ঞানও তাঁর ছিল না। দিব্য চৈতন্য সত্তায় তিনি এতই তন্ময় ছিলেন যে, সুন্দরী যুবতীগণ তাঁর কাছে নিজের অঙ্গবস্ত্র পরিধানের দরকারই মনে করতেন না।

সমবেত ঋষিসভায় শুকদেব এই রকম রূপকথার নায়ক ছিলেন। তাই তাঁর উপস্থিতি মাত্রেই সকল ঋষি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান জানালেন, অথচ তাঁর সে দিকে নজরই ছিল না।

তাঁর উপস্থিতির পর ঋষিগণ বললেন, "মহারাজ পরীক্ষিত! আপনি পরম ভাগ্যবান। আমরা যাঁর দর্শনপ্রার্থী তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। আমরা তাঁর শ্রীমুখ থেকে কিছু শ্রবণ করার জন্য আগ্রহী।"

এইভাবে সকলেই শ্রীশুকদেবকে সভাপতির আসনে বসালেন। ঋষিগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার পর পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন,

"আমি মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছেছি। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কি করলে এই অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম গতি লাভ করতে পারি।"

শুকদেব উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন এবং সকলেই নীরবে তা শ্রবণ করতে লাগলেন। শুকদেবের কথাগুলো বিনা প্রতিবাদেই সকলে একসঙ্গে বেদবাক্যের মত মেনে নিলেন। পরীক্ষিত মহারাজকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই মহাপণ্ডিত, বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও দিব্য জ্ঞানী। তাঁরা বললেন,—

"মহারাজ! আপনি এতই ভাল শাসনকর্তা, রাজচক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও ব্রহ্মযজ্ঞের রক্ষাকর্তা হয়েও সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে আজ এমন দুঃখকর অবস্থায় উপনীত। এজন্য আমরা সকলেই বিশেষ মর্মাহত।" এই ভাবে বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের প্রবক্তাগণ মহারাজকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এই রকম যাবতীয় শাস্ত্রকার গণের সেই বিরাট সভায় শুকদেবই মুখ্য বক্তারূপে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসদেব ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁরা যা সাধারণভাবে এক সীমিত ও সংক্ষিপ্ত ভাবধারার মাধ্যমে আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন, শুকদেব সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে আরও ব্যাপক ও বিশাল আকারে প্রকট করবেন।

নারদ বললেন, "আমি ব্যাসদেবকে যা দশটি শ্লোকের আকারে দিয়েছিলাম, তা তিনি আরও বিস্তার করে শুকদেবকে শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ শুকদেব যথেষ্ট ব্যাপক অধ্যাত্ম-অনুভব ও মহান্ গৌরবের অধিকারী। অন্যান্য বিদ্বান্‌গণের চেয়ে তিনি অধিক সম্মানাস্পদ। তাঁর প্রসারিত উদার দৃষ্টি কোণ সর্বত্র। ব্রহ্মানুভূতি ও গভীর তত্ত্ববিজ্ঞান থেকে ঐ অপ্রাকৃত শ্রীমদ্ ভাগবত আরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে কিরূপ বিস্তৃত আকারে প্রকটিত হবে, তাই আমরা দেখবার জন্য একান্ত উৎসুক। যাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ণিত ভগবৎ লীলা বিলাস-বৈচিত্র্যকে কেউ প্রাকৃত বা সাধারণ জাগতিকব্যাপার বলে মনে করে ভুল না করে, তার জন্য সেই সমস্ত কেবল শুকদেবের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়া চাই, কারণ তিনি উদার নিরপেক্ষঃ এবং সকলের দ্বারা তাঁর মহিমা স্বীকৃত।"

শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসদেব সেখানে বসেই আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাকে সাধারণ মানব জাগতিক ব্যাপার বলে ভুল বুঝতে পারে, সেই লীলাকথা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীর মুখথেকে শুনে তাঁরা দুজনই খুব তৃপ্তি অনুভব করছিলেন, কারণ, তা এখন সকলেই শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে গ্রহণ করবে। সাতদিন ধরে উক্ত সভায় উপস্থিত বিদ্বান্‌গণ আগ্রহের সহিত সবকথা শ্রবণ করেছিলেন।

শুকদেব বললেন, "আমি আমার প্রিয়তম পূজ্য পিতৃদেবের কাছ থেকেই এই সব শিক্ষা করেছি।" এবং তিনি সব শ্রোতাদের সাবধান করে দিয়ে আরও বললেন, "আপনারা জানেন, ধর্ম সম্পর্কে আমার কোন সংকীর্ণ ভাবধারা নাই। সবচেয়ে উদার ধর্মমতে আমি বিশ্বাসী এবং সেজন্যই আমি খ্যাতি লাভ করেছি। পূর্ণ পরব্রহ্মে আমি নিষ্ণাত এবং ব্রহ্ম বলতে যা সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম ভূমিকায়—সেই স্তরে আমি উপনীত। সুতরাং আমি যা বলছি, তাকে আপনারা সীমিত জাগতিক ব্যাপার বলে অবজ্ঞা করতে পারেন না। ঐ সমস্ত লীলাবিলাস পরজগৎ থেকেই আসছে, তা ব্রহ্মলোকেরও পরপারে, তাই তাতেই আমি আকৃষ্ট। এই জগতের কোন কিছুর প্রতিই আমার আকর্ষণ নাই। অপ্রাকৃত পরজগতের দিব্য ভূমিতেই আমি সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই অপ্রাকৃত জগতের যা কিছু লীলাবৈচিত্র্য আমাকে আকৃষ্ট করেছে, যা কিছু আমি জেনেছি, অনুভব করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, সে সমস্তই অপ্রাকৃত। এই সতর্কবাণী শুনিয়েই আমি সে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা আপনাদের নিকট প্রকাশ করছি। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা অপ্রাকৃত জগতের সবচেয়ে অধিক ঔদার্য্যময়, মাধুর্য্যময় ও রহস্যঘন। এই প্রকার বিচার বুদ্ধির দ্বারা আপনারা তা শ্রবণ করুন।"

এই প্রকার সতর্কবাণী একাধিকবার মাঝে মাঝে শুনিয়েই শুকদেব যাবতীয় লীলাকথা বলে চলেছেন। শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাসদেব মনে মনে তৃপ্তি ও সন্তোষ লাভ করেছেন—"হাঁ আমরা ঠিকই সফল—successful হয়েছি।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপক্রমেই ব্যাসদেব লিখেছেন, "প্রথম থেকেই শ্রীমদ্‌ভাগবত অত্যন্ত মধুর, আর তা শুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বিবৃতি দ্বারা আরও মধুর হয়েছে। শুকদেবের দ্বারা সুবিন্যস্ত ও সালঙ্কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতজ্ঞান এখন সর্ব প্রকার ধর্মমতদ্বারা সহজেই গৃহীত ও স্বীকৃত হতে পারবে।"

সুতরাং শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু জেনে শুনেই সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে তা জানতেন। আর এও

জানতেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের আবার আবৃত্তি হবে এবং পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি অনুকম্পাবশত তাঁরা সেখানে এসেছিলেন। তাঁরা না জেনে হঠাৎ ঘটনাচক্রে আসেন নাই।

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ আজন্মসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধিবেশনগুলি যেন তিনি নিজেই ঐ সময় বসে প্রত্যক্ষ করেছেন, এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী অনুধ্যান করলে সেই সত্যই অনুভূত হয়।

—ডঃ ডি. শাস্ত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরতত্ত্বের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ

শ্রীল মহারাজ ঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি কবলিত এই জাগতিক স্থিতিতে যে আমি সন্তুষ্ট নই এই অনুভব আমার হওয়া দরকার। যদি কেউ প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করতে চায়, তা হলে এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রযত্ন করতে হবে আর একটি ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য, ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য। আর আমরা প্রাচীন কাল থেকে শুনে আসছি যে, আমাদের জন্য আর একটি বাসস্থান আছে এবং তা আমাদের প্রাণারামের—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পদছায়া।

সত্যি সত্যিই আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন একটা কর্মসূচী তৈরী করে নেব, যাতে করে আমরা এই কুৎসিত বাসস্থান ছেড়ে আমাদের sweet home—সুখের ঘরে চলে যেতে পারি। আর তা কেনই বা এত সুন্দর এত সুখের তাও নিজের বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হবে। যদিও আমাদের বুদ্ধির দৌড় সে পর্য্যন্ত যেতে পারে না, তাই negative way তে, ব্যতিরেকভাবে বুঝে নিতে হবে যে possitive, অন্বয় বা বাস্তব বস্তু আছেই। সেই ভূমিকায় যাঁরা বাস করেন, তাঁরা ত' আমাদের সেখানে তুলে নেওয়ার জন্য চেয়েই আছেন। তাঁরা সাধু; তার জন্যই ত' আমরা সেই দেশে থাকতে চাই—তা যেহেতু সাধুদের দেশ তা অসীম—তাতে জনসংখ্যা বাড়লেও তাদের চেপে রাখার কোন আশঙ্কা নাই।

এইস্থান ত' বাসের উপযোগী নয়, তাই যেখানে সুখেতে, শান্তিতে, নিশ্চিন্তে বাস করতে পারি, তারই সন্ধান করতে হবে জন্ম জন্মান্তর ধরে। এতে ত' কোন ক্ষতি নাই, কারণ যেখানে রয়েছি, সেটা ত' আদৌ সুখের নয়; আর এই অনুভূতিটাকে পাগলামি বলা চলে না। সুখের সন্ধানে চেষ্টা করা বৃথা নয়, অযৌক্তিকত নয় বরং এইটাই সবচেয়ে যুক্তিসম্মত।

শাস্ত্র ও যুক্তির অর্থ কি? প্রথম কথা হচ্ছে, শাস্ত্র—Revealed Scriptures, সাধুদের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত বাণী এবং এইটাই possitive contribution, যুক্তি বা reasoning এই বাণীর, শাস্ত্রের অনুসরণ করবে, যুক্তি এর subservient, অনুগত। বাস্তব বস্তু হচ্ছে সত্য লোকের the world of Truth এর বিস্তৃতি, Logic বা তর্ক তার অনুগামী। তর্কের দ্বারা চিন্ময় বাস্তব অপ্রাকৃত জগতের কোন কিছুই জানা যায় না।

Logic বা তর্ক এই জগতেই প্রযুজ্য। রসায়ন বিদ্যায় যেমন Logic পুরোপুরি প্রযুজ্য হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যাপারে একটা স্বতন্ত্র Logic আছে সেইরকম পরমার্থ জগতের, অপ্রাকৃত জগতেরও Logic আলাদা। এই জগতের Logic হয় ত' পরমার্থ জগতের ব্যাপার বুঝতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে কেবল একটা আংশিক দৃষ্টান্তরূপে।

অসীম অনন্ত জ্ঞানের পাঁচটি স্তরকে বুঝতে গেলে কোনটারই শেষ পাওয়া যায় না। তার সবটাই অসীম, তা থেকে যা বিয়োগ করা যায়, তাও অসীম, আর যা অবশিষ্ট থাকে, তাও অসীম। সেই অনন্ত পরমার্থ জগৎ, অপ্রাকৃত জগৎ এমনই যে, আমরা তাতে একটা relative position আপেক্ষিক স্থিতিতেই রয়েছি। সেই অসীম, অনন্ত বস্তুর শেষ নাই। তাতে সব যায়গাতেই কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে কোথায়ও Circumference বা বহির্বৃত্ত নাই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন, "আমি সেই চরম সত্যকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তা আমি পাই নাই।" সেই সত্য এতই বিস্ময়জনক, তাঁকে পাওয়া এতই বিস্ময় যে, সেই চরম সত্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলেন, "আমি কেবল তাঁর সীমামাত্র ছুঁয়েছি"। যে রকম নিউটন বলেছিলেন, "আমি কেবল সেই মহাসাগরের তীর থেকে কয়েকটি বালিকণা, নুড়িমাত্র সংগ্রহ করেছি। জ্ঞানের মহাসমুদ্র আমার চোখের সামনে অনন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়ে গেছে। তোমাদের চেয়ে আমি হয়ত কিছু বেশী জানি, তোমরা বোকা, বোকা এই জন্যই বলছি যে, তোমরা বল, আমি সবই জেনে গেছি। কিন্তু জ্ঞানের শেষ নাই, তা কেবল একটা point এ, একটা বিন্দুতে ছোঁয়া যায় মাত্র।"

একথা নিউটন জাগতিক বিজ্ঞানের সম্পর্কে বলেছিলেন। এখন বোঝ, অনন্ত অসীম জ্ঞানের বিষয় কি প্রকার! কতটা গভীর আকাঙ্খা, ধৈর্য্য আর আশা নিয়ে আমরা সেই জগতের জ্ঞানের সন্ধান পাওয়ার জন্য চেষ্টা করব! যদি নিউটনই এই জগতের সম্পর্কে ঐ কথা বলতে পারেন, তা হলে আমরা অধীর হয়ে কয়েক মিনিট, কয়েকটা দিন অথবা কয়েক পদ এগিয়েই সেই অসীম অনন্ত জ্ঞান পেয়ে যাব, এমন কথা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি?

আমরা নিজেরাই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি; আমরা সেই অসীমের দিকে যেতে চাচ্ছি না। এত সস্তায় সবচেয়ে সেরা জিনিষটা মেরে নেব, এমন সাহস আমাদের করা সাজে না। তাই আমাদিগকে প্রস্তুত হতে হবে, আমরা সেই অসীম infinite কেই পেতে চাই, তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, নিজের আত্মসন্তোষের জন্য নয়। Die to live, হেগেল বলেছেন। Ideal Reality—আদর্শ বাস্তব এটা তার philosophy দর্শন। সত্যিই ত' আদর্শ ত' বাস্তব হওয়া চাই। Ideal Realism, the ideal is Real, সবইত idea—ভাব থেকে উদ্‌ভব হয়, তার পরে তা আকার গ্রহণ করে—তা বাস্তব বস্তুতে পরিণত হয়।

হেগেল বললেন, "He is for Himself. Everything is for Himself, and we are for Him"—তিনি ত' কেবল তাঁরই জন্য সবই ত' তাঁর জন্য, আর আমরাও তাঁর জন্যই।

We are for Him—আমরা তাঁরই জন্য। আমাদের প্রভুর অনুসন্ধান দরকার—দাসের খোঁজ দরকার নাই। হুকুম তামিল করার, চাটুকারের দরকার নাই, কেবল প্রভুই দরকার। আর সেই প্রভু বলেন, "আমার সেবার জন্য তৈরি হও, আমায় সন্তুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাক; আমার সন্তোষই পুরো মাত্রায় চাই। আর তুমি যখন আমার এলাকায় এসে পড়েছ, তখন, এখান থেকে কিছু নিয়ে পালাবে, সে হওয়ার রাস্তা বন্ধ। এখানে যা কিছু সে সবই আমার। আমার এলাকায় তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত করা এত সহজ মনে করোনা; সেটি হওয়ার উপায় নাই। আর আমি এমনধারা প্রভু যে, আমাকে পুরোপুরি Autocrat স্বেচ্ছাচারী

বলতে পার। আমি যখন সব কিছুই জানি omniscient, তখন আমি স্বেচ্ছাচারী Autocrat হওয়াই ত' যথার্থ, তুমি বশ্য, আমি অভিভাবক, আমিই তোমার একমাত্র হিতৈষী।

ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

গীতা ৫।২৯

আমি কল্যাণ বিতরণের মূলকেন্দ্র Centre, আমিই সর্বোপরি, আমার উপরে কেহ নাই—এইভাবে যদি তুমি আমাকে জেনে ভক্তি করতে পার, তবে তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন, তুমি শান্তি পাবেই। আমিই সবকিছু, আবার আমিই তোমার প্রকৃত সুহৃৎ, কল্যাণকারী। কারো কাছ থেকে কোন আশঙ্কার কারণ আমার নাই—সে যে কোন ব্যক্তিই হোক আর যে কোন পদাধিকারীই হোক।

প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বেচ্ছাচারী, মিথ্যাচারী, তখন তিনি যে আমার কল্যাণকারী—একথা কি করে বিশ্বাস করব ?

শ্রীল মহারাজ ঃ তিনি স্বেচ্ছাচারী Autocrat, কারণ সব আইনই তাঁথেকেই আসে। যখন অনেক শাসক অনেক ব্যক্তি তখন আইনের দরকার হয়। আর যখন ব্যক্তি একমাত্র তিনি—একজন তখন আবার আইনের কি দরকার। এবার বুঝলেন ত ?

প্রশ্ন ঃ হাঁ, তবে তিনি despot—স্বেচ্ছাচারী ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হা despot বটে, তবে Absolute Good. Benevolent—আগাগোড়া কল্যাণমূর্ত্তি, মঙ্গলবিগ্রহ, যদি তাঁর স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা উপস্থিত হয়, তবেই তাতে প্রাণীজগতের, সমগ্র সৃষ্টিরই ক্ষতি হবে। কল্যাণের ধারা ও অবারিতভাবে প্রবাহিত হওয়া চাই, এটা কি খারাপ ? এতে কোন আপত্তি থাকা উচিত কি ?

কল্যাণধারার স্বাধীনতা থাকা চাই—তা যখন, যেখানে খুশী যেদিকে বয়ে চলবে। তাঁর Autocracy যদি কেবল মঙ্গলই হয়, তবে তাতে আমাদের ক্ষতিই বা কি ? আর তা না হয়ে কেবল অজ্ঞ, বোকাগুলোই কি

Autocrat হবে? শয়তানগুলোই কি autocrat হবে? যদি কাউকে autocrat হতে দেওয়া হয়, তবে তা মঙ্গলমূর্ত্তিকেই হতে দিতে হবে, শয়তানকে নয়। আর সেই কল্যাণবিগ্রহ কৃষ্ণকেই যদি আইনে বাঁধতে হয়, তবে তাতে আমাদেরই সমূহ অমঙ্গল।

প্রশ্ন ঃ তিনি যে মিথ্যাবাদী—এর উত্তর কি?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ মিথ্যাবাদীইত' বটে? তবে তা ত' কেবল আমাদিগকে ভুলিয়ে তাঁর নিজজন করে নেওয়ার জন্য। পূর্ণ সত্যস্বরূপকে কি আমরা পুরোপুরি বুঝে নিতে পারি? তাই আমাদেরকে তাঁর নিজের দিকে ধীরে ধীরে টেনে নেওয়ার জন্য, তাঁর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে কিছু মিথ্যেকথা বল্‌তেই হয়। আর তিনি যদি পূর্ণ কল্যাণস্বরূপ হন তবে তাঁর কাছ থেকে যাই আসুক, সবই মঙ্গলময়। অমৃত থেকে যা আসে, সে সবই অমৃত। তিনিই এ বিশ্বের মালিক, সবই তাঁর। আর আমরা যেটুকু মালিকানা জাহির করি, তা ত' অনধিকার দুঃসাহস! আর তিনি মাঝে মাঝে যে আমাদের মত হয়ে কখন কখন অনধিকার প্রকাশ করেন, সেটা তাঁর লীলা-খেলা। তাঁর মিথ্যাটাও চরম মঙ্গলময়। তিনি যা বলেন তাই ত' ঘটে। তিনি বললেন, "জল হোক"। অমনি জল হোল। তিনি বল্‌লেন, "আলোক হোক", অমনি আলোক হোল। যখন মূল কেন্দ্রবিন্দুর এই প্রকার ক্ষমতা আছে, তখন তাতে মিথ্যা বলে কোন কথাই থাকতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ যদি তিনি এই সবই, যেমন, স্বেচ্ছাচারী, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি, তবে তিনি যে আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্খী, তা কি করে বুঝব?

শ্রীল মহারাজ ঃ বেশ! তিনি এই জগতে আমাদের স্বাধীনতা—freedom দিয়েছেন কেন? কারণ সুখ, আনন্দ অনুভব, আস্বাদন করতে গেলে free choice চাই। Free choice না থাকলে আস্বাদন করবে কে? জড়পদার্থ, কাঠ—পাথর কি আনন্দ অনুভব করতে পারে? তিনি বৃহৎ চৈতন্য, জীব অণু চৈতন্য। অণু চৈতন্যের যদি freedom of choice—free will না থাকে তবে, সে ত' জড়পদার্থ হয়ে যাবে—তোমার কাছ থেকে

যদি freedom ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, তবে তুমি কাঠ-পাথর হয়ে যাবে। এইটাই কি চাও ? পাথরের কি অভাব আছে ?

Freedom, free choice দেওয়া হয়েছে ভালকে বেছে নিয়ে মন্দটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য। সকলেই কি খারাপই থাকবে—কোনটাকেই free choice দেওয়া যাবে না ? এইটাই কি বাঞ্ছনীয় ? ?

তাই এই সব কথা নিজের মনের মধ্যে চিন্তা কর আর কেন্দ্রের সঙ্গে adjust করতে চেষ্টা কর। আমরা ঠিকই আছি, আর তাঁর মধ্যে কিছু গলদ আছে, এটা যেন মনে না হয়। এই রকম মনোবৃত্তি পোষণ করা আমাদের পক্ষে আদৌ শুভ নয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর আর গলদ কেবল আমার মধ্যেই আছে। আমাকে স্বাধীন চিন্তা, free will দিয়ে তিনি ত' কোন অন্যায় করেন নাই। যদি আমাদের স্বাধীন চিন্তা, free will না থাকে, তবে প্রকৃত সুখ, চিদানন্দ আস্বাদন করব কি করে ?

প্রশ্ন ঃ তা হলে "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং··· ·····"

শ্রীল মহারাজ ঃ এত তলায় থেকে এত উচ্চস্তরে কেন ? 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং'—কিসের জন্য একথা বলছ ?

প্রশ্ন ঃ আমার ত' মনে হয়, তিনি আমাকে ত্যাগই করেছেন। আর তিনি আমার ভিতরে আছেন বা বাহিরে আছেন ? তিনি আমাতে আছেন, না আমার মধ্যে তিনি নাই—কিছুই বুঝতে পারি না।

শ্রীল মহারাজ ঃ তিনি সব সময় তোমাতেই আছেন, তবুও তিনি আদৌ তোমাতে নাই। তিনি সর্বদাই নেপথ্যে আছেন—আমার সামনে নাই। তাঁকে আমি ধরতে পারি না, কারণ তিনি ত' অসীম, অনন্ত। তিনি অসীম, অনন্ত, আর আমি একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র। তাই তাঁকে যতই পাইনা কেন আমার তৃপ্তি আসবে কি করে ?

তিনি ত' আমার ভেতরেই আছেন, তবে তা, পরদার আড়ালে, নেপথ্যে, আমি কিন্তু তাঁর খুব সামান্য অংশই দেখতে পাই, অবধারণার মধ্যে আনতে পারি। তাই তাঁর কতটুকুই বা আমি পাই ? তবে আমি এও জানি,

তিনি কত বিরাট্, কত মহান্; আমি তদনুপাতে কত ক্ষুদ্র, কত অণু মাত্র! সুতরাং কৃষ্ণের উপলব্ধি, কৃষ্ণকে পাওয়ার ব্যাপারে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি—satisfaction, dissatisfaction, দুটিই সমান অনুভাব ভক্তের হৃদয়ে যুগপৎ থাকে। আমার অস্তিত্ব বা সত্তা এতই ক্ষুদ্র এবং আমার পেছনে যিনি রয়েছেন, তিনি অসীম অনন্ত। তাই তাঁর যেটুকু আমি দেখি, পাই বা অনুভব করি, তা ত' সামান্যই। নেপথ্য স্বর বলে উঠে, "যা দেখছ, তা ত' সামান্য।" সেখানে আরও অনেকে রয়েছেন। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন সেবাধিকারে রয়েছেন। তা কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধ ছাড়া নয়। একটা সুন্দর সামঞ্জস্য, co-operation তাতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। আমিও তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সম্বন্ধিত। এই জড় জগতে আমরা সব সময়ই অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট। যদি আমি একধাপ উপরে উঠি, তবে আরও উপরে উঠবার আশা জাগে, শেষে গোটা পৃথিবীটার অধীশ্বর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে, তার পরেও সূর্য্য মণ্ডলটাকে অধিকার করতে চাই। আশার কি আর শেষ আছে? ঠিক সেই রকম পরজগৎ, চিদ্‌জগৎ, চিদ্‌বিলাস ভূমিতেও সেবাধিকার পাওয়ার আশার শেষ নাই।

আবার আর এক প্রকার তৃপ্তির রাজ্য আছে যেখানে সাধক নিজের সত্তাকে হারিয়ে পূর্ণ সমাধিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এটা ব্রহ্মলোক ও বিরজাতেই সম্ভব। তার একদিকে আমরা পাই কল্যাণ, আর অন্য দিকে পাই তার বিপরীত। চিদ্ রাজ্যে সেবার জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। আর বিষয়-বিগ্রহের সেবা নেওয়ার কামনারও অন্ত নাই। সেখানে নিজের সত্তা বজায় রেখেও সেই অনন্ত মাধুর্য্য সাগরে সেবাসুখ আস্বাদন করা যায়, তাতে নিজের ভাল মন্দ বিবেচনা করার কোন অবকাশই থাকে না।

প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মলোকটি কি?

শ্রীল মহারাজ ঃ ব্রহ্মলোক তাকেই বলে যেখানে আমরা জড় সত্তা, অহংভাব ego কে হারিয়ে ফেলি, কিন্তু চিৎ-সত্তা অপ্রাকৃত স্বরূপ, আত্মস্বরূপের সন্ধান পাই না। ব্রহ্মলোকটি একপ্রকার marginal position, তটস্থ অবস্থা। এটা ত' noman's-land-নিরপেক্ষ ভূমিকা। একটা দিক এই

জড় জগতের সংস্পর্শে এবং আর একটা দিক্ চিৎ জগতের দিকে সংপৃক্ত-ঠিক এটা দুই রাজ্যের সীমারেখা। এক দিকে অন্ধকার, অন্য দিকে আলোক, এক দিকে জড়, অন্য দিকে চেতন রাজ্য ; ঠিক যেমন গোধূলি-অন্ধকার ও আলোকের মিলনরেখা।

প্রশ্ন ঃ শঙ্কর ও বুদ্ধ—এঁরা কি সেই বিরজা বা noman's land-এর ব্যক্তি ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ একজন এই ভোগের জগতের দিকে, আর একজন ত্যাগের জগতের দিকে। ব্রহ্মলোক বিরজার চেয়ে একটু উচ্চতর ভূমিকা। বিরজা হচ্ছে প্রকৃতির জলরূপ, আর ব্রহ্মলোক আলোক বা পুরুষের অধিষ্ঠান।

'তৎ লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুঃ', ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যে, একটি আলোক রেখা এই জলময় প্রকৃতিতে এসে পড়ছে। প্রকৃতি অর্থ বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি, যা থেকে বিপর্য্যয় বৃত্তি এসে থাকে, দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে থাকে। যখন প্রকৃতিতে ঐ আলোকরশ্মিরেখা পতিত হয়, তখন একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয় আর সেই চিৎ রশ্মিরেখা বীজরূপে প্রকৃতিতে প্রোথিত হয়, তা থেকে জড়জগতের সৃষ্টি হয়, তাই সৃষ্টির মূল উপাদান, তাকেই বলে মহত্তত্ত্ব।

মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ গীতা ১৪।৩

হে ভারত ! জড়া প্রকৃতি, যাকে প্রধানতত্ত্ব বলা হয়, তা-ই গর্ভ, সেই গর্ভে আমিই জীবাত্মরূপ বীজ বপন করি, সেই জীবাত্মা তটস্থা শক্তিতে উৎপন্ন হয়, সেই তটস্থ অবস্থা থেকে ব্রহ্মাদি সকল জীবের সৃষ্টি হয়।

'অহং বীজপ্রদঃ পিতা' আমিই বীজপ্রদ পিতা—'তৎ লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুঃ', আমার ঐ স্বরূপকে শম্ভু বলা যেতে পারে। এই প্রকৃতির মধ্যে পরতত্ত্বের যে অংশ প্রবেশ করে গতিশীল হয় এবং এই জগৎকে ব্যতিরেকভাবে সৃষ্টি করে, সেই তত্ত্বই শম্ভু।

সেই মহাজ্যোতিকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা দেখতে পাব যে, তাতে অনেক বিভাগ আছে। অনেক জীবাত্মা তাতে রয়েছেন। সকলেই কিন্তু

সেবক সম্প্রদায়; আর আমিও তাঁদের মধ্যে একজন হয়ে সেবা করতে পারি। বৈকুণ্ঠ রাজ্যে কেবল সমর্পণ, আত্মনিবেদনের জীবন। আমরাও সেখানে নূতন জীবন পেয়ে নিজের স্থান করে নিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ আত্মজ্ঞান লাভের এইটাই কি চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিকা?

শ্রীল মহারাজ ঃ এটা তৃতীয় ভূমিকা। এই তৃতীয় ভূমিকাকেই আচার্য্য শঙ্কর তটস্থ সীমারেখা বলে নির্দেশ করেছেন। আর আচার্য্য রামানুজ চতুর্থ ভূমিকার কথা বলেছেন। সেখানে ঐশ্বর্য্য প্রধান, সম্ভ্রম এবং পরম পূজ্য ভাবনাসহ সেবা করা যায়।

তার ঊর্দ্ধে'ই রয়েছে গোলোক; সেখানে যাবতীয় ভাব-সেবার কথা। গোলোক বলতে ধর একটা ফুটবল, যেটার চারিদিক সমান, কোথাও একটু আঁকা-বাঁকা বা ফাঁক নাই। সেই ভূমিকাতে আমরা দেখব যে, তা সবচেয়ে ঘণীভূত, সর্বব্যাপক, সর্বভাব সমৃদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভূমিকা। এইটিই হল প্রেম, সৌন্দর্য্য ও স্বারসিকীসেবার রাজ্য, কৃষ্ণলোক, সর্বাকর্ষক সর্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের রাজ্য। এ রাজ্যের মুখ্য কর্ত্তৃ প্রেমস্বরূপা মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর কায়ব্যুহগণের দ্বারা সব কিছুই manage করেন।

সে রাজ্যের প্রবৃত্তি হল অহৈতুকী-অপ্রতিহতা; কোন হেতু নাই, কোন বাধাও নাই। সেখানে স্বয়ং ভগবান্ আর মহাভাব; অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবনার চরম পরিণতি, সর্বশেষ পরিপ্রকাশ। সেখানে কেবল প্রেম ও সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। এ রাজ্যকে আবিষ্কার করে আমাদের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং শ্রীমন্ চৈতন্য-মহাপ্রভু। সে রাজ্য প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের এমন আকর্ষণ, তাঁতে আমরা প্রলুব্ধ হয়েছি আর তার জন্য সাধনাও করছি। সেই আকর্ষণ যে আমাদের সেই লোকে নিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস, আশাবন্ধ আমাদের হয়েছে। সে জগতের agent-তাঁর নিজ জনগণ এ জগতে নেমে আসেন, এখানে বিচরণ করেন এবং আমাদের এমন প্রেরণা দেন, যাতে করে আমরা সেই লোকে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। সেই লোকে যাওয়ার একটা visa সার্টিফিকেট ত' দরকার। তোমরা সেই সার্টি-ফিকেট চাও কি? সেই জগতের জন্য একটা প্রবেশপত্র তোমাদের দরকার নাই?

ঠিক সেই জগৎ থেকেই নাম-রূপী শব্দব্রহ্ম নেমে আসেন আর আমরা সেই শব্দব্রহ্মের সেবার দ্বারা সেই লোকে যেতে পারি। কিন্তু নাম সেবার অভিনয় বা অনুকরণ দ্বারা সে লোকে যাওয়া যায় না, অন্য কোন জগতে চলে যেতে পারি, যেখানে আমাদের সত্তা লোপ পেয়ে যেতে পারে। শব্দের শক্তি এত প্রবল !! হোমিওপ্যাথিক globules, বড়িগুলো ত' দেখেছ, সবগুলোই একরকম কিন্তু তাতে ঔষধ থাকলে তার শক্তি কত, তা ত' জান। সেই শক্তিই আসল জিনিষ, বড়িগুলো ত' চিনির তৈরী।

বৈকুণ্ঠ নাম, তা কেবল জড়জগতের শব্দ মাত্র নয়, নামেতে নিহিত শক্তিই মুখ্য। কোন্ শব্দে কোন্ শক্তি কত পরিমাণে আছে, তা বুঝা দরকার। কেবল শব্দের তরঙ্গ মাত্র নয়, শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিই ক্রিয়া করে। শব্দের সেই ভাবই সব কিছু বা প্রকৃত বস্তু।

প্রশ্ন : দশ নামাপরাধের নবমটি হল অশ্রদ্ধালুকে নামোপদেশ দান। মায়াবাদী, শৈব প্রভৃতি নির্বিশেষবাদীদের নামোপদেশ দেওয়া কি অপরাধ-জনক ?

শ্রীল মহারাজ : বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ বড় হওয়ার মত উপযুক্ত ক্ষেত্রের দরকার। তা না হলে উষর, পাথুরে জমিতে বীজ বপন করা কেবল বৃথা শ্রম মাত্র। শ্রদ্ধা, শিষ্য, গুরু—এসব প্রকৃত হওয়া চাই ; আর সে সবের লক্ষণ ত' শাস্ত্রেই বলে দেওয়া হয়েছে। শিষ্য যথার্থ লক্ষণযুক্ত হওয়া চাই, এবং তার চিত্ত-প্রস্তুতি ও ঠিক ঠিক হওয়া চাই, বীজ ও যথার্থ হওয়া দরকার, তা হলেই তবে যথার্থ ফল হবে।

প্রশ্ন : আপনি একবার প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলেন, ফাঁকাগুলির আওয়াজের মত—Blank fire এর মত নামও ফাঁকা অর্থাৎ বৃথা হতে পারে। এ কথা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীল মহারাজ : যদি কেবল শব্দটাই হয় তা ঠিক ঔষধবিহীন হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলস্ এর মত কিছুই কাজের হয় না। ঔষধের কাজ শুধু চিনির তৈরী বড়িগুলোতে পাওয়া যায় না। ওতে কি ফল হবে ? সেই রকম নামের কয়েকটা অক্ষর, কিন্তু আসল নাম না হলে তাতে কোন

মঙ্গলই হবে না। নামাক্ষর বাহিরায় বটে—এর অর্থ কেবল নামের খোলস মাত্র, শব্দ মাত্র, তার মধ্যে কোন আসল বস্তু ত' নাই। তাতে কেবল অসার ফলই পাওয়া যাবে, প্রকৃত নাম সেবার ফল তা থেকে কি করে মিলবে? তুমি ত' চিঠির পর চিঠিগুলিতে এই রকম নানা প্রশ্নই করে চলেছ! তোমার সবপ্রশ্নই শেষ হয়েছে কি?

প্রশ্ন ঃ আমার শেষ পত্রে একটি জানবার কথা ছিল। মহর্ষি নারদ না কি বলেছেন, দানবরাও ভক্তের চেয়ে অধিক নিষ্ঠাযুক্ত দেখা যায়। এটা কি করে বুঝব?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ। অনেক সময় অন্যাভিলাষের বশবর্তী হয়ে তারা অধিক নিষ্ঠাসহ কঠোর তপস্যা করে থাকে। তা কিন্তু নিম্নস্তরের ব্যাপার। ঐ প্রকার তপোনিষ্ঠা তাদের খুব জোর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীল রূপগোস্বামী এ সব বিচারের সমন্বয় দেখিয়েছেন তাঁর বিবৃতিতে,—

যদ অরিণাদ্ প্রিয়াণাংঞ্চ
প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ
কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২৭৬

ঠিক যেমন সূর্য্য ও তাঁর কিরণ, কৃষ্ণ ও ব্রহ্মলোক সেই রকম, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক কৃষ্ণের জ্যোতিঃমণ্ডল। কৃষ্ণের দ্বারা নিহত দানবগণ সেই জ্যোতি-মণ্ডলেই প্রবেশ করে। আর ভক্তগণ তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধি লালসা অনুযায়ী অপ্রাকৃত গোলোকে বিভিন্ন লীলাস্থলীতে প্রবেশ করে। কৃষ্ণের স্বকীয় পরিকরগণের মধ্যেও সেবা—সাধনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

ঘরের ঝি যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে নববিবাহিতা বধূ ও সেই দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকে, কিন্তু দুজনেরই position আলাদা। কৃষ্ণের সেবক পরিকর, প্রিয়মণ্ডলের বেলায়ও ঠিক সেই প্রকার জানতে হবে।

কামাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্তেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

ভা ৭।১।৩০

যাঁরা সাধারণ স্তরের সাধক ভক্ত, তাঁরা সহজেই নিজ সেবা-নিষ্ঠায় সিদ্ধি লাভ করতে পারে এবং অভীষ্ট সেবাধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু যে সব রাগমার্গের সাধকভক্ত কৃষ্ণের একান্ত অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লালসায় সেই অন্তরঙ্গ পরিকরগণের একজন হতে চায়, তাঁদের সেই সিদ্ধি লাভ করা এত সহজ নয়। এতে আর বুঝবার কি আছে!

শ্রীকৃষ্ণের একত্ব সম্পর্কে কিছু বিশিষ্ট বিচার আছে। তিনি এক হয়েও বহু। বাইরে তাঁর একপ্রকার প্রকাশ, আর নিজের অন্তরঙ্গ কোঠায় তাঁর আর একপ্রকার প্রকাশ। একই কৃষ্ণস্বরূপের এই যে বিভিন্ন প্রকাশ বৈচিত্র্য, তার বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু করে রেখেছেন। স্বরচিত 'লঘুভাগবতামৃতে' শ্রীল রূপ গোস্বামী এই বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, "সেবোন্মুখহি জিহ্বাদৌ" অর্থাৎ কেবল সেবেন্মুখ বা সেবা-মনোভাব দ্বারাই ঐ গূঢ় রহস্য ভেদ করা যায়। নাম নিতে গেলে বা যে কোন সেবা করতে গেলে ঐ একটি যোগ্যতা নিশ্চয় থাকা চাই— যাকে বলে ভক্তি, সেবা মনোবৃত্তি। তা নাহলে কেবল বাহিরের কতকগুলো লোক দেখানো তথাকথিত সেবা দ্বারা কিছুই হয় না। কারণ তা ত' আসল বস্তু নয়। আমি এক কোটি নাম লই না কেন, কেবল নামাক্ষর দ্বারা কিছুই পাওয়া যাবে না। নামে আন্তরিক অনুরাগ থাকা চাই, তবেই শ্রীকৃষ্ণনামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। নামের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও নিষ্ঠা যে পরিমাণে গাঢ় হবে, সেই অনুপাতে আমরা কৃষ্ণের রাজ্যে গোলকে কোন্ স্থানে যাব, তাঁর বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ সেবা সৌভাগ্য পাব, তা নির্ণীত হবে। এই প্রকার বিচার সেখানে আছে। একই কৃষ্ণলোকে এত প্রকারভেদ রয়েছে; তাই কেবল সবই সমান, সবই এক—এটা কেবল কথার কথা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে থাকেন তখন তিনি পূর্ণতম আর অন্য গোপীদের সঙ্গে থাকার সময় তিনি এক ডিগ্রী কম।

ভক্তগণ এইপ্রকার নানারকম দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের স্বরূপবৈভব ও প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন ; কৃষ্ণপ্রেম কতটা ঘনীভূত, প্রেমের গাঢ়তা কত, এসব বিবেচনা করে থাকেন। যাইহোক, এই সব পার্থক্য বৃন্দাবনে আছে।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন সময় আমরা ভাবের তীব্রতা বেশ অনুভব করি।

শ্রীল মহারাজ ঃ আমাদের নিজের সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমেই আমাদের এই সব তত্ত্ব বুঝতে হবে। সেই ভূমিকায় যাওয়া হয় ত' একটা কাল্পনিক গল্প বলে মনে হতে পারে। যাই হোক, সে ভূমিকায় ত' আমাদের পৌঁছাতেই হবে।

আমাদের নিরুৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ নাই। করুণা আছেই, আর সে করুণার শেষ নাই কৃষ্ণের জন্য আমরাও bankcrupt দেউলে হয়ে যাব না। কৃষ্ণও দেউলে হয়ে পড়বেন না। তাঁর করুণা অসীম ; যদিও তা পাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। কৃষ্ণকৃপার কোন হেতু নাই, কোন condtion, সর্তও নাই। তা যে কোন স্থানে, পাত্রে নেমে আসতে পারে ; কৃষ্ণকৃপালাভ না করার মত কোন অযোগ্যতাই জীবের নাই। কৃষ্ণকৃপা স্বতন্ত্র, যে কোন ব্যক্তিকে তা আত্মসাৎ করে নিতে পারে। অত্যন্ত পতিত অধম ব্যক্তিও কৃষ্ণকৃপা পেতে পারে, আর নিজ যোগ্যতায় আস্থাবান্ অহংকারী ব্যক্তিও বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥

চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৮

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, "শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু করুণার অবতার। তিনি কৃপাবিতরণে পাগল, কে কৃপার যোগ্য, কে অযোগ্য এ রকম বাছবিচার করবার মত ন্যূনতা তাঁর নাই। তাঁর কৃপাপারাবার কেবল বন্যার মত আসে আর সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর স্বভাবই এই। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আবার বলেন, "এই বিচারেই আমি তাঁর কৃপালাভের সৌভাগ্য পেয়েছি। আমার যোগ্যতা

অযোগ্যতার বিচার তিনি করেন নাই। অহৈতুকী কৃপার ঢেউ এল, আর আমার মত অযোগ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এমনই নিত্যানন্দ প্রভুর দয়া! আর এমনই আমার অবস্থা! আমি তাঁর কৃপার কণামাত্র আস্বাদন করেছি, তা না হলে আমি ত' অধম হয়েই রয়ে যেতাম। তাঁরই কৃপায় আমি শ্রীরূপকে পেয়েছি, শ্রীসনাতনকে পেয়েছি। এঁদের মত ভক্তশ্রেষ্ঠদের স্নেহ সৌভাগ্য আমি পেয়েছি। আমি যে পেয়েছি, এ কি করে অস্বীকার করব? আর এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে আমি যা দিয়েছি, তা কি তাঁদের কৃপাব্যতীত সম্ভব হত? তাই সাহস করে বলছি, যা দিয়েছি তার মূল্য অনেক। এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যা দেওয়া হয়েছে, তা এত উচ্চ স্তরের বস্তু!! এটা অস্বীকার করি কি করে? তা করলে আমি ত' অশ্রদ্ধ, অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব! তা বলতে গেলে সে সব তত্ত্ব আমার নয়। তা মহাজনের অহৈতুকী কৃপায় আমার মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছে। তারা আমাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন; আমি তাঁদের হাতের পুতুল হয়ে গেছি, তাঁরা আমাকে যে ভাবে নাচায় সেভাবে নেচেছি। ঐ গ্রন্থে আমি যা লিখেছি তা অত্যন্ত পবিত্র ও উচ্চস্তরের বস্তু, কিন্তু তা আমার নিজের, এ কথা আমি বলতে পারিনা তা তাঁদের দেওয়া অমূল্য সম্পদ, আমার হৃদয়ে গচ্ছিত আছে মাত্র; যে কোন সময় তাঁরা তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। তা মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের মহাসাগর, এ আমি অস্বীকার করতে পারব না। কৃষ্ণকৃপা স্বাধীন, তা দাতার নিজস্ব ইচ্ছাধীন বস্তু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরতত্ত্বের ক্রম-প্রকাশ

প্রশ্ন ঃ অনেক শাস্ত্র বলেন, শিবই পরং ব্রহ্ম পরতত্ত্ব, Supreme God Head,-এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

শ্রীল মহারাজ ঃ শিব পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু বিষ্ণু সর্বোচ্চ পরতত্ত্ব। শিব তাঁর উপাসনা করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেন। তাঁদের capability সত্যানুসন্ধানে যোগ্যতা ও অধিকার অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকট করে থাকেন। প্রাথমিক গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, সূর্য্য স্থির আছে, অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরছে। কিন্তু উন্নততর গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখা যায়, সূর্য্যও ঘুরছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহগুলিও তার চারপাশে ঘুরছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সব তথ্য-গুলি বুঝাতে পারা যায় না। তথ্যটা অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে বোঝান যায়। পারমার্থিক শাস্ত্রগুলিও ঠিক এই পন্থাই অনুসরণ করেছেন। তার দ্বারা লোকে ধীরে ধীরে নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে সত্যকে ক্রমশ ধরতে পারার চেষ্টা করবে। যখন তারা যথার্থ তথ্য বুঝবার মত স্তরে পৌঁছাতে পারবে, তখন শাস্ত্র বলবেন, যা বুঝেছ, সেইটাই শেষ কথা নয়, আরও আছে। তোমাকে আরও এগোতে হবে।" স্বতঃস্ফূর্ত শাস্ত্র রহস্যগুলির বেলায় ঠিক ঐ পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে।

লোকে ব্যবায়ামিষ মদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তো ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

ভা ১১।৫।১১

আংশিকভাবে কিছু কিছু করে সত্যবস্তুর জ্ঞান মহাজনগণ প্রকাশ করেন। কারণ মানব সমাজ এক সঙ্গে পূর্ণ বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব বুঝবার যোগ্য

হয়ে উঠে না। যথাযথ বৌদ্ধিক বা আত্মিক বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরতত্ত্বকে অবধারণার জন্যে আনা সম্ভব নয়। শাস্ত্র উপদেশ দিয়ে বলেন, যদি কামের তৃপ্তি চাও, তবে বিবাহ করে স্ত্রীর সঙ্গে শাস্ত্র সম্মত সহবাস কর। যদি মাছ মাংস খেতে লোভ থাকে, তবে তা কোন দেব দেবীকে প্রথমে অর্পণ করে সে বিষয়ে জানাশুনা ব্যক্তিগণের সাথে গ্রহণ করতে পার। যে, পশুর মাংস তুমি খাবে, তাকে তোমার যত পুণ্য তা অর্পণ করতে হবে এবং এ সব কর্মে যারা অভিজ্ঞ, তাদের পরামর্শ নিয়ে মাংসাদি খেতে পার।

সেই রকম, যদি তুমি মদ খেতে চাও, তবে তা প্রথমে সেই প্রকার দেব-দেবীকে অর্পণ কর, তার পরে খাও। তবে তার অর্থ এই নয় যে, তুমি খেতে চাইছ না, এ সব বিধি তোমাকে খেতে বাধ্য করছে, "যেহেতু তুমি যখন এসব না খেয়ে থাকতে পার না—এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, তখন তোমাকে কিছুটা restriction কিছুটা বিধি-নিষেধের মধ্যে ফেলে তোমাকে একটু আধটু সুযোগ দিচ্ছি, তার পরে বলা যাবে—এ সব আর না; তোমাকে আর একটু উচুদরের উপদেশ দেওয়া যাবে, তা তোমাকে মেনে নিতে হবে।"

তার পরে এখন শাস্ত্র বলেন, "তুমি ত' পঞ্চাশ বৎসর ধরে এসব খুব ভোগ করলে, এখন ত্যাগের পথে এস। সবই ছেড়ে দাও; আর নয়। এখন এস, ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলের জন্য সৎপন্থার অনুসরণ কর।

এই ভাবে ক্রমোন্নতির সোপানগুলি শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। মানবজীবন ত' ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ভালর দিকে। প্রথমে ব্রহ্মচারী বা ছাত্র জীবন, তার পরে গার্হস্থ্য অর্থাৎ কর্মজীবন; তৃতীয় অবস্থা হ'ল বানপ্রস্থ বা retired life। আর চতুর্থ বা শেষ আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস—সব ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ নিরপেক্ষ জীবন। জীবনযাত্রাকে এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

শৈব পুরাণ সমূহে শিবকেই supreme পরব্রহ্ম বলা হয়েছে। পুরাণ-গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ১৮টি পুরাণের মধ্যে ছয়টি সাত্ত্বিক বা উত্তম, ছয়টি রাজসিক বা মধ্যম, আর ছয়টি তামসিক বা নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণের জন্য উদ্দিষ্ট।

এই রকম শ্রেণীবিভাগের কথা পুরাণেই পাওয়া যায়। গৌড়ীয় কণ্ঠহার বইতে এ সমস্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকৃতির লোক রয়েছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদের জন্য সাত্ত্বিক পুরাণ, রাজসিক প্রকৃতির লোকদের জন্য রাজসিক পুরাণ আর যারা তামসিক প্রকৃতির লোক, তাদের জন্য তামসিক পুরাণসমূহের ব্যবস্থা। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছয় ছয়টি পুরাণ অন্তর্গত। "পুরণাৎ পরাণম্" পুরাণগুলি বেদার্থ পরিশিষ্ট বা পরিপুরক। অর্থাৎ বেদসমূহের অর্থকে পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ করে বলে 'পুরাণ'। পরমার্থ পথ অবলম্বনের যোগ্যতা এবং অধিকার অনুযায়ী শাস্ত্র বিভিন্ন সোপানের পন্থা নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ পুরাণগুলি আমাদের নিম্নস্তরের উপদেশ দিয়েছেন—এই কথা আমরা বলতে পারি তাহলে ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ, কতকগুলি পুরাণ নিম্নাধিকারীগণের জন্য minimum আচরণবিধি নির্দেশ করেছেন। যার প্রকৃতি অত্যন্ত তামসিক, তার জন্য যত কম সম্ভব উপদেশ দিতে হবে। যে কিছুই করতে পারে না বা চায় না, তাকেও পরমার্থ পথে একটুখানি নিয়ে আসার জন্য যতটা কম সম্ভব তার বাসনাকে একটু সুযোগ দিয়ে পরে লাগাম কশে ধরা আর কি ! যে ঘোড়াটা বশ না মেনে দৌড়ায়, তাকে কিছুটা দৌড়োতে ছেড়ে দিয়ে, তার পরে লাগাম টেনে বশে আনার মত তামসিক পুরাণগুলির উপদেশ।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে "মাছের নাম করে একটা তালিকা দেওয়া হল। মাছ যদি খেতে চাও, তবে এই মাছগুলি খেতে পার। তার বাইরে যে সব মাছ আছে, সেগুলি খেয়ো না।" এর মানে এই নয় যে, মাছ না খেলে অন্যায় হবে। যেহেতু তুমি মাছ না খেয়ে থাকতে পারবে না বা মাছ ছাড়া তোমার খাওয়াই হবে না, তার জন্যই আমি বল্‌ছি, অমুক মাছ খেলে অমুক রোগ হবে, ঐ মাছ খেলে শরীরের ও মনের উপর ঐ প্রকার কুপ্রভাব পড়বে, তাই যে মাছটা খেলে কম খারাপ হবে, সেটাই খেতে বলছি। তবে আমার ভিতরের উদ্দেশ্য হল, কিছু দিন বাদে তুমি মাছ খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দাও। তোমার ঐ তামসিক দ্রব্য খাওয়ার বাসনা রয়েছে, তাই তোমাকে

এইভাবে সেই আমিষ খাওয়ার প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করতে চেয়েছি। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'।

উপনিষদেও ঘোড়ায় চড়ার উপমা দেওয়া হয়েছে। একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘোড়াটি দৌড়াচ্ছে। আরোহী লাগাম টানলেও সে ফিরছে না। তাই তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুটা দৌড়াতে ছেড়ে দিয়ে আরোহী আবার লাগাম টেনে তাকে ফিরাতে চেষ্টা করে। এই ভাবে কয়েক বারের চেষ্টায় ঘোড়াটি ঠিক রাস্তায় আসে ও বশ মানে। উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, আমাদের অহং Ego ঐ ঘোড়ার মতই দৌড়ায়। এই দেহটাই হল রথ, আর ইন্দ্রিয়গুলো হল ঘোড়া, তারা আমাকে তাদের ইচ্ছামত বিষয় ভোগের দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাকে ত' তাদের গতিকে অন্যদিকে divert করতে হবে। তারা হয় 'ত আমার নির্দেশ মানবে না। তাই তাদের কিছুটা ছেড়ে দিতে হবে, আবার সংযত করতে হবে। এইভাবে কয়েকবার সংযত করার পর তারা আমার বশ মানবে।

বিষয় ভোগের প্রবল বাসনা ত' আমাদের আছেই। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'। এখন কর্তব্য হল ঐ ভোগপ্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ একেবারেই নিবৃত্ত করতে হবে 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ'।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচরঃ॥

গীতা ৩।৯

যা কিছু কর, সবই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে কর। তা না হলে সবই ভোগ, ভোগজনিত কর্ম বন্ধন তার ফলে সংসার দুঃখরূপ প্রতিক্রিয়া ভুগতে হবে। শাস্ত্রের উপদেশ মেনে সবই যখন কেন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণের সম্বন্ধে যোগযুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর নিজের কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। তখন কৃষ্ণই সব দায়িত্ব বহন করবেন।

প্রশ্ন ঃ পুরাণগুলিতে কি বর্ণাশ্রমের কথা আছে ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ, তা ত' আছেই।

প্রশ্ন ঃ কেবল সাত্ত্বিক পুরাণেতে বর্ণাশ্রমের কথা আছে? রাজসিক ও তামসিক পুরাণে নাই বুঝি?

শ্রীল মহারাজ ঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সব পুরাণেই বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা ও শ্রেণীবিভাগের বিষয় আছে। কিন্তু সাত্ত্বিক ত' আর নির্গুণ নয়। নির্গুণ বিচার ত' যে কোন বর্ণ বা আশ্রম থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। কোন শূদ্র ও নির্গুণ ভক্তি পথ আশ্রয় করতে পারে অথচ ব্রাহ্মণ হয়েও সে সে সৌভাগ্য নাও পেতে পারে এবং সেও নিম্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই উচ্চ ও নীচ বর্ণে জন্মলাভ ঠিক গাড়ীর চাকার মত উপর তল হওয়া আর কি। ব্রাহ্মণই যে আবার ব্রাহ্মণ জন্ম পাবে, তার ঠিক নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়ে জন্মাতে পারে আবার শূদ্র ও ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে পারে। কেউ উচ্চবর্ণে জাত হয়ে নীচ কর্ম ফলে নীচ বর্ণে জন্মায়, আবার সুকর্ম করলে উচ্চবর্ণে জন্মাতে পারে।

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।' সত্ত্বাদি ত্রিগুণ স্থান পরিবর্তন করে; কিন্তু নির্গুণ তা করে না। তার মূল্য স্থায়ী। একজন শূদ্রও নির্গুণ অবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে, ব্রাহ্মণ ও তা করতে পারে। যে কেউ নির্গুণ অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। যারা এই নির্গুণ অবস্থায় পৌঁছতে পারে না, তারা সুকর্ম-কুকর্ম ফলে উচ্চ-নীচ যোনির নাগরদোলায় ঘুরপাক খেতে থাকে। ভোগপ্রমত্ত হওয়া মানে ভারী হয়ে নীচে যাওয়া, আবার কর্মফল শেষ হলে হালকা হয়ে উপরে ওঠা। এটা একটা vicious circle-বিষাবর্তের মত। নির্গুণত্ব লাভ করার অর্থ এই vicious circle থেকে নিস্তার পাওয়া।

> তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
> ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
> তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
> কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ভা ১।৫।১৮

যাঁরা বাস্তবিক বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিকচেতনা প্রবণ, তাঁরাই জানেন, বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বা বিভিন্ন গ্রহে ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভই

নাই। জাগতিক দুঃখ যেমন না চাইলেও ভোগ করতে হয়। সুখ ও সেইরকম না চাইলে ও আপনি এসে যায়। জন্ম-জন্মান্তরে নানা যোনি ভ্রমণ করতে করতে কোন অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে জীব নির্গুণস্তরে যেতে পারে এবং উচ্চ-নীচ যোনি ভ্রমণ রূপ Vicious circle থেকে রেহাই পায়।

প্রশ্ন ঃ বর্ণাশ্রমধর্মে শূদ্রেরও ত' কিছু বিধি-নিষেধ পালন করার কথা আছে!

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ! তাতে করে সে তামসিক থেকে রাজসিক এবং শেষে সাত্ত্বিক ভূমিকায় যেতে পারে। তবে এ সবই সেই ত্রিগুণের গণ্ডী। নির্গুণ অবস্থা এর উপরে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

একজন ব্রাহ্মণের হয়ত সব সুযোগ থাকতে পারে, তা সত্ত্বে সে নির্গুণ অবস্থায় যেতে নাও পারে। সে ব্রহ্মলোকে গেলেও সেই জড়জগতের মধ্যেই যাতায়াত করে। নির্গুণ সত্তার সম্পর্ক ত' বর্ণাশ্রম ধর্মেরও অতীত। বর্ণাশ্রম আবার দু'রকম, আসুর-বর্ণাশ্রম ও দৈব-বর্ণাশ্রম। যে বর্ণাশ্রমের ফল নির্গুণত্ব প্রাপ্তি, তাহাই দৈব-বর্ণাশ্রম। আর যে বর্ণাশ্রমধর্ম কেবল এই মায়িক জগতের সুখ-দুঃখের জন্য উদ্দিষ্ট, তাহাই আসুর বর্ণাশ্রম। তাই যে বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের ফলে নির্গুণ অবস্থায় পৌঁছান যায়, তাই শ্রেয়স্কর। নতুবা সবই বৃথা।

প্রশ্ন ঃ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় মাংসাহার সমর্থিত একথা কি বলা যেতে পারে?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ, সগুণ স্তরেতে সে রকম কিছু ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কোন কোন পশুকে বধ করা ব্যাপারে কিছু মন্ত্র, কিছুবিধি নিষেধ, কোন নির্দ্দিষ্ট দেবদেবী, কোন নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠী-এ সব বিচার তার মধ্যে রয়েছে। আবার যে পশুর মাংস খাওয়া যাবে, সে পশু খাদকের যাবতীয় পুণ্য হরণ করে পরজন্মে উন্নত জন্ম পাবে—এ সব কথাও তৎসম্পর্কীয় গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। হয়ত নির্মম হত্যা থেকে এটা কিছুটা কম modified violence, কিন্তু তাতে কি আসে যায় ও সবই ত' এই মায়িক জগতের ব্যাপার। তাতে না আছে নির্গুণত্ব, না আছে ভক্তির কথা। যারা এই ভাবে

পশু মাংস খায়, তারা ত' ভক্তির ধারও ধারে না। ও সব তামসিক, রাজসিক বা খুব জোর সাত্ত্বিক ব্যাপার।

কিন্তু দৈববর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় ওসব নিষিদ্ধ একেবারে অচল। তাতে ফল, মূল, শাক সব্জি কেবল নারায়ণকে অর্পণ করে তা প্রসাদরূপে গ্রহণ করা। এতে যারা দেয়, প্রস্তুত করে, তাদের ওটা ভক্তিরই ব্যাপার—সেবার কথা। তাতে কোণ অন্যায়ই হয় না। এতে খাদ্য ও খাদক উভয়ই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, কারণ তারা পরতত্ত্বের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। তবে এইটাই শেষ কথা নয়। এর উপরেও আরও উন্নত বিচার আছে।

> দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম।
> এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য।

বিপর্য্যয় জগতে সবই ত' বিপর্য্যয়। তাতে আবার ভালই বা কি মন্দই বা কি? সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্ন! স্বপ্নটা ভাল স্বপ্ন কি খারাপ স্বপ্ন, তাতে প্রভেদ কতটুকু! অলীক জগতে একটাকে ভাল বলা, আর একটা খারাপ বলা—সবই মিথ্যা, বিপর্য্যয়।

প্রশ্ন: যে পশুকে হত্যা করা হয়, সে কি আবার সেই পশুযোনিতে জন্ম নেয়?

শ্রীল মহারাজ: সব ক্ষেত্রে নয়। তার পূর্বজন্মের কর্মফলটা আগেই ফলবে। বসুদেব ও দেবকীর বিবাহের পর কংস যখন তাঁদের রথে বসিয়ে নিয়ে চলেছিল, তখন আকাশবাণী হল, "তুমি যাঁদের এত আদর করে নিয়ে যাচ্ছ, তাঁদেরই অষ্টম গর্ভ তোমাকে হত্যা করবে। এই কথা শুনে কংস যখন দেবকীকে চুলে ধরে তার মাথা কেটে ফেলার জন্য প্রস্তুত হল, তখন বসুদেব তাকে বুঝিয়ে বললেন, "তুমি একি করছ? তুমি এত বড় বীর হয়ে তোমার বোনকে হত্যা করতে যাচ্ছ? এই বলে তাকে আরও বললেন, "পরজন্ম ত' মৃত্যুর আগেই আরম্ভ হয়। জন্ম, পুণর্জন্ম ত' মৃত্যুর পূর্বেই স্থির হয়ে যায়। এটা কি করে হয়? মৃত্যুর আগে পূর্ব কর্মগুলি তাকিয়ে থাকে তার ফল পাওয়ার জন্য, তাই প্রত্যেক কর্ম তার ফল যত শীঘ্র সম্ভব পেতে চায়। এ সবই ত' কম্পিউটারের মত আপনা আপনি হয়ে যায়।

মৃত্যুগ্রস্ত আত্মা দেহ ছেড়ে পূর্ব কর্মানুসারে যেখানে সেখানে যেতে পারে এবং তদনুযায়ী দেহ ধারণ করে। তাই একজন মানুষও মৃত্যুর পর বৃক্ষ জন্মও পেতে পারে। এমন কি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেও দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ পাথর ও গাছ হওয়ার দৃষ্টান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

সুতরাং যখন একজন মরে যায়, তার পরে সে যে কোন জন্ম পেতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ যে পুনর্বার ব্রাহ্মণ জন্ম পাবে, তার কোন স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণ ও তার পূর্ব কুকর্মের ফলে অত্যন্ত নীচ জন্মও পেতে পারে; আবার একজন চণ্ডালও সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে পারে। কর্মের প্রাবল্য অনুসারে পরবর্ত্তী ফলের তারতম্য ঘটে। কর্মের গুরুত্ব অনুসারে কোন্ কর্মফল আগে ভুগতে হবে, কতটা ভুগতে হবে তা নির্ভর করে।

—×—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্তর নিষ্ঠাই নিরাপত্তা

শ্রীল মহারাজ : পবিত্রতার অন্য নাম ভগবৎ সুখানুসন্ধান। প্রত্যেক জীবের অন্তরে এই পবিত্রতা রয়েছে। কিন্তু তা বিভিন্ন আবরণ দ্বারা আচ্ছন্ন। ঐ আবরণ সরে গেলেই জীবের ভগবৎ সুখানুসন্ধান রূপ আসল সত্তা প্রকটিত হয়। এইটিই তার আত্মস্বরূপ সত্তা। এতে কেবল তাঁর সেবা প্রবৃত্তিই একমাত্র কাজ। এই কথাটা বুঝতে পারলে তবে সবই ঠিক আছে দেখতে পাওয়া যায়। গোলমাল তখনই বাধে, যখন আমরা উপাস্যকে প্রভু, সেব্য না দেখে দেখি আমার হুকুম তামিল করার লোক, আমি ভোগ-মোক্ষ, যা চাইব, তিনি তা জুটিয়ে দেবেন। এই ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাই কামনা-বাসনা-বন্ধনের কারণ। কিন্তু আসলে ত' তা নয়। তিনি সেব্য, প্রভু ; আমি তাঁর দাসের দাস। আমিই তার সেবা করব, আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে। লোক সেবা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, দেশ সেবা, সমাজ সেবা—এসব ত' সাধারণ তথাকথিত বিজ্ঞ কিন্তু পরমার্থতত্ত্বে অজ্ঞ লোকের কাজ ; আমার নয়। আমরা ভোগই করি, আর ত্যাগই করি, সবই ত' রোগ। জীবের যাবতীয় ব্যাধির মূল হল এই ভোগ আর ত্যাগ। এ দুটোই ত' নিজের জন্য, জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ সেবাই তার স্বরূপ ধর্ম। এইটাই হল মূল কথা, আসল তত্ত্ব—basic idea.

প্রশ্ন : প্রত্যেক আত্মাই কি পরতত্ত্বের সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত? আত্মার পরস্পর সম্পর্ক কি নাই ?

শ্রীল মহারাজ : হাঁ, তারা পরতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিক করে নেয়। তবে এদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী আছে। নিজের স্বাভাবিক প্রীতির গাঢ়তা অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসের রসিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যেক জীবাত্মা-সম্বন্ধিত। এমন কি এতে প্রতিযোগিতাও আছে, কিন্তু তাও সেই সেবাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে, ভক্তকে সাধন পথে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যেতে হয় ; ভক্তির অনুকূল গ্রহণ করতে হয়, প্রতিকূল ত্যাগ করতে হয়। নিম্ন স্তরের বস্তু ত্যাগ করে উন্নত স্তরের বস্তু গ্রহণ করতে হয়। এ বিষয় একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীল মহারাজ ঃ ওসব ভিন্ন ভিন্ন সোপান, stage এর কথা। সবই বিচার ভ্রান্তি। সাধনার অর্থ এগিয়ে চলা—progress, এই progress কোন কোন পন্থায় দ্রুত হয়, কোন কোন অবস্থায় শিথিল হয়। মায়া বা আবরণের কম-বেশী হওয়া কারণে ঐ গতির তারতম্য দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের সাধনপথে গতি দ্রুত হচ্ছে কি শিথিল হচ্ছে, এটা বুঝব কি করে ?

ল মহারাজ ঃ তা ত কেবল সুকৃতি ও সাধুসঙ্গের দ্বারা জানা যায়। তার মূলে নিশ্চয় কিছু পূর্ব সুকৃতি বা অজ্ঞাত সাহায্য। যখন আমার অজ্ঞাতে কোন কৃপা লাভ হয়, তার কারণ সেই অজ্ঞাত সুকৃতি ; আর যখন আমার জ্ঞাতসারে কিছু কৃপা লাভ হয়, তার মূলে সাধুসঙ্গ। আর সেই সাধু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ সাধু আবার বিভিন্ন শ্রেণীর ? এ কি রকম ? বুঝতে পারছি না।

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ ! সাধুর আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। আমাদেরও আবার স্বাধীনতা আছে—আমরা কি প্রকার সাধুর সঙ্গ করে সাধনা করব। যে প্রকার সাধুর সঙ্গ করব সাধনার ফলও সেই প্রকার হবে।

প্রশ্ন ঃ তার অর্থ আমরা প্রাচীন ভাবধারার অনুগমন করব ?

শ্রীল মহারাজ ঃ Misconception অর্থাৎ মায়িক জগতে শ্রেণীবিভাগ আছে। এরও বিভিন্ন সোপান বা gradation আছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এত প্রকার স্তর আছে। সৃষ্টিতে আবার কীট, বৃক্ষ, পশু—এ সব বিভাগ ত' আছেই। এও সম্ভব যে, একটা মানুষ সেই ত্রিগুণ নিগড় পেরিয়ে নাও যেতে পারে, অথচ একটী বৃক্ষ ত্রিগুণ স্তর পেরিয়ে নির্গুণ স্তরে পৌঁছাতে পারে। একজন মানুষের মায়ার বন্ধন কাটাতে

অনেক জন্ম লাগতে পারে, অথচ একটি পশু বা বৃক্ষও নিজের শোচনীয় অবস্থা থেকে এক জন্মেই মুক্তি পেতে পারে।

প্রশ্ন : সাধুসঙ্গ ব্যাপারেও কি গ্রহণ-বর্জন প্রভৃতি বাছ-বিচার দরকার ?

শ্রীল মহারাজ : হাঁ, সাধুসঙ্গ ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন আছে—কি প্রকার সাধু, আমার প্রতি তাঁর অনুকূল স্নিগ্ধতা আর আমার পূর্বার্জিত সুকৃতি। এসব বিষয় ত' বিবেচনা করতে হবে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

গীতা ১৮।১৪

এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করেই কাজ করতে হবে। দেহ, অহং (ego আত্মা ও প্রকৃতি), বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, কর্মচেষ্টা, দৈব অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা—এতগুলির বিচার আছে। কেবল কোন একটাই নয়, যে কোন effect বা কার্য্যের পেছনে অনেকগুলি cause, কারণ থাকে। তার স্বাধীনতা, পূর্ব পরিবেশ, বর্তমান সঙ্গ, তার স্বভাব—এই সমস্ত তার উন্নতিতে সহায়তা করে। এতে পরিবেশ circumstance এর প্রভাব অনেক বেশী, কেবল সাধকের স্বাধীনতার উপর সব কিছু নির্ভর করে না।

প্রশ্ন : ভক্ত বা বৈষ্ণব প্রতি অপরাধ কি প্রকার ?

শ্রীল মহারাজ : সাধকের অজ্ঞাতেও যদি বৈষ্ণবাপরাধ থাকে, তবে তাতে উন্নতি পথে যথেষ্ট বাধা দেবে। কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন অনেক কিছু থাকে, যার উপর সাধকের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে।

প্রশ্ন : প্রত্যেক পরিস্থিতি ত' ভিন্ন ভিন্ন ; তার মধ্যে কোনটা কত গুরুতর তা কি করে বুঝব ?

শ্রীল মহারাজ : সাধক যখন বৈষ্ণব বা সাধুর আনুগত্যকেই পরমার্থ-রাজ্যের সবকিছু বলে গ্রহণ করার বিচারে পরিনিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার আর সবজাগতিক ধর্ম-কর্ম গৌণ হয়ে যায়। ভগবৎপ্রীতির যে সূক্ষ্মস্তরে আমরা প্রবেশ করতে চাই, তারই অনুকূল ব্যাপারেই প্রাধান্য দিতে হবে।

যাঁরা উন্নতস্তরের সাধু, তাঁদের কৃপা বা অকৃপার প্রভাব যথেষ্ট বেশী, আর যাঁরা তা নন, তাঁদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম—এটা সাধারণ কথা।

আমি হয় ত' এগোতে চাই, কিন্তু যদি প্রকৃত সাধুমহাজনের অনুকম্পা না থাকে তবে বাধা আসবেই। তবে আমার নিম্নভূমিকার ব্যক্তিদের আপত্তি অভিযোগে তেমন অসুবিধা হয় না। তাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কৃপাকেই যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে যাতে তাঁদের চরণে কোন অপরাধ না হয় এবং তাঁরা যেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। আর এর জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কি এই ধরা ছাড়ার বাহিরে ?

শ্রীল মহারাজ ঃ কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা ত' গুরু ত্যাগের কথা দেখতে পাই এবং তা ত' শিষ্যের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্য বলব। যাঁর উপর আমি পুরোপুরি নির্ভর করতে চাই, তাঁরই যদি কোন সাংঘাতিক দোষ দেখা যায়, তবে তা ত' আরও দুর্ভাগ্যের কথা, আর শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতি তাতে ব্যাহত হবেই। গুরুত্যাগ ত' সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। তবে গুরুদেবের অপ্রকটের পর যদি আমি কোন স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ নিজের চেয়ে উন্নত বৈষ্ণবের সহায়তা গ্রহণ করি, তাতে গুরু ত্যাগ ত' হয়ই না, উপরন্তু তাতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীগুরুদেবেরই সেবা অধিক সুষ্ঠুভাবে করা যায়। শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর আমরা উন্নত সাধুর সহায়তা লাভ করতে প্রযত্ন করব। যদি গুরুদেবের কোন নিজজনের সাহায্য পাই তা ত' ভালই। কারণ তাতে আমরা সাধনপথে তাড়াতাড়ি এগোবার প্রেরণা পাই। আর সাধনোপায় সম্পর্কে অনুকূল উপদেশ পাওয়াতে আমাদের উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়ার কোন বাধাই থাকে না।

বিপদ বাধে তখনই যখন গুরুদেবের প্রকট অবস্থায় শিষ্য কোনও কারণে গুরুকে ছেড়ে যায়।

ঐ প্রকার পরিস্থিতি যে খুবই সাংঘাতিক, এতে কোনও সন্দেহ নাই। আর সে অবস্থায় যুগপৎ সাময়িক ও চিরন্তন—এই দুই প্রকার বিচার-বিবেচনার সমস্যা এসে পড়ে। এ অবস্থায় সাময়িক বা অস্থায়ী বিচার

ছেড়ে দিয়ে যেটা স্থায়ী বা নিত্য কালের প্রয়োজন, সেইটাই করা দরকার, তারই গুরুত্ব বেশী বুঝতে হবে।

হয়ত আমরা ভুলপথে চলে যেতে পারি, তাই অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগকরে বৈষ্ণবগুরু গ্রহণ করা, সগুণ ত্যাগকরে নির্গুণ গ্রহণ সহজ। কিন্তু নির্গুণ-স্তরের গুরুর প্রকটকালে তাঁকে পরিত্যাগ করাত' খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। কোন কোন শিষ্যের ভাগ্যে সে প্রকার পরিস্থিতি আসতেও পারে। আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও এমন তথাকথিত গুরু থাকেন যারা নিজেকে বৈষ্ণব বলে প্রচার করে, কিন্তু আসলে তারা বৈষ্ণবই নয়। তারা হয়ত প্রথমে কিছুটা আন্তরিকতা নিয়েই আসে, কিন্তু ক্রমশঃ অসৎসঙ্গের ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়। এ ত' খুবই জটিল সমস্যা। তবে এ অবস্থায়ও পথ বের করে নিতে হবে। যখন দেখা গেল যে এ প্রকার দুর্ভাগ্য এসে পড়েছে, তখন শিষ্যকে কিছু সমাধান ত' বের করতেই হবে। এও সম্ভব যে, তেমন শিষ্য হতাশ হয়ে ভাবতে পারে, এ জন্মে বুঝি আমার আর ভক্তিপথে উন্নতির কোন ভরসাই নাই। আমার গুরু নির্বাচন ত ভুলই হয়ে গিয়েছে, আমার লক্ষ্য ব্যর্থই হল, আর এত আমারই দুর্ভাগ্য। যাই হোক আমি প্রভুর চরণে এই প্রার্থনাই জানাব—আগামী জন্মেই যেন আমি উন্নতির সন্ধান পেতে পারি।

কিন্তু এমনও কোন কোন বলবান্ সাধক থাকতে পারেন, যিনি তাঁর সাধন সহায়ক গুরু পরিবর্তনও করতে পারেন। বিশেষতঃ এতে হতে পারে যখন তেমন একনিষ্ঠ সাধক গোড়াতেই ভুল বশতঃ কোনও যথার্থ যোগ্যতা-বিহীন গুরুকে আশ্রয় করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে পূর্ব গুরু ছেড়ে উন্নত ও যথার্থ গুরুকে আশ্রয় করেন। কারণ সাময়িকভাবে তাঁর যৌবশক্তিকে যে অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন করেছিল, তা কেটে গিয়েছে।

তিনি ঠিক এই প্রকার চিন্তা করতে থাকেন,—"আমি ত' through ticket কেটেছি। গাড়ীতে উঠে ত' কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি। এখন দেখছি, এ লাইনে সামনে কিছু বাধা আছে, আর এগিয়ে যাওয়া নাও হতে পারে। তাই এখন এই জংশনে নেমে অন্য একটা লাইনের গাড়ী ধরে নিরাপদ পথে লক্ষ্যস্থলে যেতে পারি।"

যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, সামনে বিপদ আছে, তবে যদিও through ticket কেনা হয়েছে, তবুও সেই গাড়ী থেকে কোন জংশনে নেমে গিয়ে অন্যকোন লাইনের গাড়ী ধরে যাওয়া দরকার। এই প্রকার বিচার ত' ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক।

প্রকারান্তরে কেউ এ রকমও ভাবতে পারে—টিকিট যখন কিনেছি, তখন এই গাড়ীতে যাবই, যা হবার হোক। কিন্তু এ বিচারকে বুদ্ধিমানের বিচার বলা চলে না। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানই আসল কথা। পথটাই লক্ষ্য নয়। এ পথে গেলে বিপদ আছে, তাই এ পথ ছেড়ে অন্যপথে অর্থাৎ যে পথে গেলে নিরাপদে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারি সেই পথই ধরব। এইটাই ত' commonsense—সাধারণ জ্ঞান।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশাস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

গীতা ৬।৪০

নিজের সাধনায় যার আন্তরিকতা আছে, তার কোন দিক থেকে অমঙ্গলের কোন আশংকা নাই। তার কারণ হল, গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানই তার পথপ্রদর্শক ও রক্ষক। সব কিছুই তাঁর ইঙ্গিতে তাঁরই আদেশে সম্পন্ন হচ্ছে।

এর পরেও সঙ্গ বিচারের কথা আছে। ধর আমি ঠিক লাইনের টিকিট কেটে ঠিক গাড়ীতেই উঠেছি এবং লক্ষ্যের দিকেই চলেছি; কিন্তু মাঝপথে কোন প্রতারক বা দুর্বৃত্ত আমার বিশ্বাস জন্মিয়ে তার মন্দ উদ্দেশ্য সাধন করার অভিপ্রায়ে বলতে পারে, "না আর যাওয়ার দরকার নাই। সামনে বিপদ আছে, এই খানেই নেমে পড়।" আমি হয় ত' তার কথায় বিশ্বাস করে ভুলপথে পা দিতে পারি, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ত্যাগ করতে পারি।

আবার এও হয়, আমি ঠিকই পথ ধরেছি, কিন্তু কোনও কারণে আমার মনে সন্দেহ হল। তখন দ্বন্দ্বে পড়ে গুরুত্যাগ করি। আবার পরে ভেবে চিন্তে নিজের ভুল বুঝতে পারি আমি। মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। এমন ত' হয়েই থাকে।

যাইহোক, আমাদের আপন লালসা থাকলে আমরা নিশ্চয় রক্ষা পাব। আবার সেই অকপট আন্তরিক বাসনাটি আমাদের পূর্ব সুকৃতির উপর নির্ভর করে। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যে পূর্ব সঞ্চিত সুকৃতির প্রকারের তারতম্য অনুযায়ী আমি সবসময়েই সাহায্য পেতে থাকবো। নেপথ্য থেকে আমাকে নির্দেশ দিতে থাকবে—"এইটিই কর, এইটিই কর।" আন্তরিকতাই আসল কথা।

প্রত্যেক কাজের অনেকগুলো কারণ থাকে, কিন্তু যারা নিজের সাধনায় আন্তরিক এবং নিজেকে সাহায্য করতে আগ্রহী, তারা ভুল পথে বেশী সময় যেতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের ভুলটি সংশোধন করে নিতে পারে। এইটিই তো আমাদের আশা, ভরসা ও সান্তনা। আমি যদি নিজেকে নিজে ঠকাতে না চাই তবে পৃথিবীতে কেউই আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমাদের এই রকম মানসিক স্বচ্ছতা নিশ্চয় দরকার, কারণ উপরের সন্ধানী চোখটা সব সময়ই আছে। আমাদের এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিশ্চয় থাকা চাই যে, ভগবানের দৃষ্টি সর্বত্র সর্বদাই রয়েছে। আমি হয়তো তা দেখতে নাও পেতে পারি ; কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু আর তাঁর কাছে আমি যেতে চাই, তিনি এইটুকু জানলেই হলো। যার কাছে আমি যেতে চাই, তিনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন, সবই জানতে পাচ্ছেন, এর চেয়ে আর ভরসার কথা কি আছে! তবে এটা তো এতো ছোট খাটো ব্যাপার নয় ; তিনি অসীম আর আমি হলাম সসীম, একটি ছোট্ট অনুমাত্র। এত সাংঘাতিক দুঃসাহস, একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, আর আমরা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছি কেবল আমাদের আন্তরিক কামনা নিয়ে। আন্তরিক প্রেরণা আর কামনাই সবকিছু।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আমাদের এইযে calculating mentality বা হিসাব করার বুদ্ধি, এতে কোন কাজে হবে না ?

শ্রীল মহারাজ ঃ তাতে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যাবে না। তবে আমরাতো কোন কোন অবস্থায় ঐ হিসাব করাটাকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। তবুও আমাদের এটা জানা দরকার যে ঐ হিসাবি বুদ্ধি শেষ

পর্যন্ত আমার কাজে নাও লাগতে পারে। যেখানে আমি যেতে চাচ্ছি তাঁর যদি সাহায্য পেতে চাই তা হলে তাঁর সেই কৃপাবল অকপট প্রার্থনা দ্বারা নেমে আসবে। আমি তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি তাঁর Agentকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর আমি যদি আমার চলার পথে তাঁর দেওয়া একজন সাথী পেয়ে যাই, তা হলে আমার চলাটা আরও নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হবে। তাই কেবলই চাই প্রার্থনা আর শরণাগতি। আমরা যখনই শরণাগত হই, তখনই আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু এই যে calculation বা হিসাবের কথাটা বলা হলো তা আত্ম-সমীক্ষা ধরণের হওয়া চাই—"এখানে আমার তো কিছুই নাই, কোন সামর্থ্য নাই, তাই আমি কি করে উদ্ধার পাবো? আমার যা কিছু জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি আছে, তার তো কোনো মূল্যই নাই, আমার স্বাধীন চিন্তা, বিচারবোধ সবই তো অতি সামান্য! সুতরাং অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া এবং তার দিকে কিছু এগিয়ে যাওয়া, এসবতো একেবারেই অসম্ভব", এ রকম আত্ম-সমীক্ষাই আমাদের শরণাগতি এনে দিতে পারে। পরমার্থ সাধকের পক্ষে শরণাগতি আর কাতর আর্ত্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শরণাগতির অর্থ নিজেকে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া। আমরা যে পরিমাণে নিজেকে তাঁকে দিতে থাকবো, সেই পরিমাণে আমাদের প্রার্থনা ফলপ্রসূ হবে। যখনই আমরা নিজেকে একেবারে অসমর্থ বলে উপলব্ধি করতে পারবো, তখনই আমাদের আর্ত্তি সত্যি সত্যিই অকপট হবে, আর উপরের দিক থেকে সেই পরিমাণে সাহায্য নেমে আসবে।

মোটের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র কথা হলো সাধুসঙ্গ। পরস্পর নির্ভরশীল অনেক ব্যাপার আছে। তার মধ্যে সাধু সঙ্গকেই সর্বপ্রথমে প্রাধান্য দিতে হবে, আর এই সাধু সঙ্গ পূর্ব সঞ্চিত সুকৃতির উপর নির্ভর করে। ওজন আরম্ভ করতে গেলে অনেক কিছুর প্রতি নজর দেওয়া দরকার। তার মধ্যে কতকগুলিকে বেশী জোর দিতে হবে, প্রথমে সাধুসঙ্গ, তারপরে শাস্ত্র, তার পরে শরণাগতি, তার পরে প্রার্থনা prayer; এই সব যদিও পরস্পর পরিপূরক ও নির্ভরশীল, তথাপি সাধু সঙ্গকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সাধু সঙ্গের অর্থ হলো আমার চেয়ে অধিক উন্নত

সাধকের সঙ্গ ; তারপরে শাস্ত্র অর্থাৎ আরো উন্নত সাধুদের উপদেশ। এই দুটোরই সাহায্যে আমরা শরণাগতিতে practical step নিতে পারবো আন্তরিকতা থাকলেই ঠিক ঠিক শরণাগতি হয় আর এই আন্তরিকতার অর্থ হলো "আমি একেবারে অসহায়" এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা। এই অসহায় বোধ যত তীব্র হবে, আমার আর্তিও সেই সেই পরিমাণে তীব্র হবে, আর তখনই সেই অনুপাতে উপর থেকে সাহায্যও নেমে আসবে।

সঙ্গ অর্থ সেবা মনোভাব, কেবল physical contact নয়। সেবোন্মুখতাই উপরের ব্যাপারের সঙ্গে যোগযুক্ত করতে পারে আর কোন কিছুর দ্বারাই তা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ তাহলে প্রার্থনা কি আশীর্বাদ চাওয়ার ব্যাপার ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হ্যাঁ, prayer কিন্তু খাঁটি হওয়া চাই "O Lord ! Give me my bread", 'হে ভগবান আমাকে অন্ন দাও' এও তো এক রকম prayer, আরেক রকম prayer আছে "আমাকে রক্ষা করো, আমার প্রকৃত স্বার্থ কি, তাও আমি জানি না, দয়া করে আমায় আলো দাও।" কতো রকমের প্রার্থনা তো আছেই। আমাদের প্রার্থনাটা কিভাবে হবে তা নির্ভর করছে আমাদের সাধুসঙ্গ ও পারমার্থিক উপদেশের উপর।

প্রশ্ন ঃ ভগবানের মহিমা কীর্তনের চেয়ে তাঁর আমার হৃদয়ে প্রকাশের প্রার্থনা কি বেশী গুরুত্ব পূর্ণ ?

শ্রীল মহারাজ ঃ হ্যাঁ, "কৃপা করে প্রকৃত সত্য আমার হৃদয়ে প্রকাশ কর। কে আমি, আমি কোথায়, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, সেখানে আমি কি করে পৌছাব, কেনই আমি কষ্ট পাচ্ছি, এই দুঃখ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমি জানি না। কৃপা করে আমায় সাহায্য করো। আমি জানি না, কিন্তু কেবল আন্দাজ করতে পারি যে তুমি সকল কল্যাণ, আনন্দ ও সুখের আকর। আমি তোমাকেই চাই। আমি আমার বর্তমানের অবস্থায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর আমি সহ্য করতে পারি না। কৃপা করে আমায় তুলে নাও।"

প্রশ্ন ঃ এই রকম প্রার্থনাই কি ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর এতেই কি বেশী জোর দিতে হবে ?

শ্রীল মহারাজ ঃ সর্বোত্তম প্রার্থনাটিই এই রকম—"আমি তোমার সম্পর্ক চাই-ই, তুমি আমায়—যেভাবে চাও কাজে লাগাও। তুমি আমাকে তোমার আপন করে নাও, আমাকে তোমার সম্পর্কে রেখে যেভাবে খুশি কাজে লাগাও। আমার কিছু চাওয়া বা আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে তা নয়। আমি কেবলই চাই—আমি তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, আর তুমি তোমার ইচ্ছা মতো আমায় ব্যবহার করো। আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস্যেই নিরন্তর থাকতে চাই। তোমার সম্পর্ক একটু চাই, আর সে সম্পর্ক কি, তা তুমিই জান। কিসে কি হয় তাও আমি জানি না, আর কিসে ভালো হয় তা তুমিই জান। কেবল তোমার আপন জন রূপে আমাকে কাজে লাগাও।" আমাদের প্রার্থনাটা এই প্রকারই হওয়া দরকার।

প্রশ্ন ঃ আমাদের কি খুব desperate হয়ে যাওয়া দরকার ?

শ্রীল মহারাজ ঃ Desperate, হ্যাঁ! তাতো বটেই ; আর তা শিষ্যের উপরেই নির্ভর করে। যে যতোই উচ্চতর বস্তুর অনুভব পেতে থাকে তার desperateness ততোই বেড়ে চলে। এই শরণাগতি মানেই তো desperate হওয়া, মরিয়া হয়ে লাগা। আমার যা হওয়ার হোক, আমি কিন্তু তোমার শরণ নিলাম। তুমিই তো আমার সব আশা ভরসার স্থল। আমি নিজেকে তোমার কাছেই সঁপে দিলাম, তাতে যা বিপদ আপদ আসে আসুক তা আমি সহ্য করবোই।"

এর উদাহরণ তো প্রহ্লাদ মহারাজ স্বয়ং। তিনি নিজের জন্মদাতা পিতার কাছ থেকে কতোই না অত্যাচার, দুঃখ যন্ত্রনা পেয়েছেন। এরকম তো আরো বহু উদাহরণ আছে। তুমি যদি প্রকৃতই শরণাগত হও, তা হলে তোমাকে অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে ; আর যদি তুমি desperate হয়ে, মরিয়া হয়ে না লাগো, তা হলে তোমাকে ফিরে আসতে হতে পারে। এই রকম desperate হয়েই সব অত্যাচার, সব দুঃখ-যন্ত্রণা, যা কিছু আসুক,

তোমাকে একটুও বিচলিত হওয়া চলবে না। নিজের উন্নতির পথ থেকে একটুও সরে আসতে হবে না।

যে কোন অবস্থায় যা কিছু বাধা আসুক না কেন, তা জ্ঞাত সারেই হোক আর অজ্ঞাত সারেই হোক, আমাদের নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকতেই হবে। কেবল তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখে সব বাধাকেই রুখে দাঁড়াতে হবে, সব যন্ত্রণাকেই মাথা পেতে নিতে হবে, খুব শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, কারণ আমার একটা সান্ত্বনা, solace যে, আমি সত্যের জন্যই দাঁড়িয়েছি।

রাজনৈতিক ব্যাপারেও দেখা যায়, যখন কোনও ব্যক্তি বন্দী হয়ে যায়, তখন তাকে যে কোন অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। গুপ্তচরও অর্থের জন্য শত্রুর এলাকায় ঘুরতে থাকে, যদি ধরা পড়ে যায়, তবে তাকেও সব রকম অত্যাচার ভোগ করতে হয়। No risk, no gain, বিপদের ঝুঁকি নেব না ত' পাব কি করে? আর সত্যের জন্য, সত্যে পৌঁছাবার জন্য যদি সমূহ বাধাই আসে, তবে কি করব? আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে। আমি ত' কোন অন্যায় করছি না। আবার যীশুখৃষ্টের মত আমাকে এও বলতে হবে "পিতা! তারা জানে না তারা কি করছে, তাদের ক্ষমা কর।"

প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক না কেন, সেগুলোকে কেবল আমরা সেইভাবে না নিয়ে চিন্তা করব—সে সবই কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই আসছে, আমার প্রিয় মঙ্গলময় প্রভুর ইচ্ছাতেই আসছে। তিনি আপাত দৃষ্টিতে এই অসুবিধা গুলি পাঠিয়েছেন। এত তাঁরই করুণা। প্রতিকূল ব্যাপারগুলিকেও আমরা এই বিচারে অনুকূল করে নিতে পারব। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। তাই তাঁর ইচ্ছাতেই আমার আপাত বাধাগুলি আসছে। আমি তাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার, তার প্রতিরোধ করার চিত্তবৃত্তি কেন রাখব? তাই এই বাধা ও দুঃখের মধ্যে তারই কোন মহৎ ইচ্ছা রয়েছে। আমার পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলগুলিকে তিনি ভোগ করিয়ে নিতে চেয়েছেন। তা না হলে আমাকে ত' অনেক জন্ম ধরে ঐ কুকর্মের ফল ভোগ করতে হত। তিনি অতি অল্পেতে খুব কম সময়ের

মধ্যে সেগুলিকে শেষ করিয়ে নিতে চেয়েছেন। তাই এ সবই তাঁরই করুণা। যদি এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে আমরা ঐ সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও বাধা বিপত্তিকে গ্রহণ করতে পারি তবে আমরা খুব শীঘ্রই তা থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

মা যখন ছেলেকে শাসন করে, তখন তার অন্তরালে তার বাৎসল্য স্নেহই থাকে। সেখানে প্রতিশোধ স্পৃহা ত' নাইই, বরং তাতে স্নেহ শুভেচ্ছাই থাকে। মা ত' ছেলেকে সংশোধন করার জন্যই শাসন করে। তখন যদি ছেলে এই মনোভাবই নেয়—"হাঁ মা! তুমি আরও শাসন কর, আমি ত' অনেক দুষ্টুমিই করছি, আমার আরও শাস্তি পাওয়া দরকার", তখন মা তাকে মুক্ত করে দেন। "ও! এ ত' তা হলে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, অনুতপ্ত হয়েছে, একে আর শাস্তি দিয়ে কাজ নাই, ছেড়ে দিই।" শাস্তি-দানের সুফল পাওয়া গেছে, তাই আর শাস্তি কেন?

সুতরাং যখন আমাদের সম্মুখে প্রতিকূল অবস্থা আসে, তখন আমাদের এই বিচারই দরকার—"এ ত' ভগবানেরই করুণা দুঃখ রূপে এসেছে আমার সংশোধনের জন্য; আমাকে শীঘ্র মুক্ত করার জন্য। হাঁ এসো, আমি ত' এইই চাই। তুমি ত' আমার হিতকারী বন্ধু, দুঃখের বেশে তুমিই আমার কল্যাণকারী। আমাকে চিরতরে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ত' তোমার আগমন। আমার প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত যখন কিছুই হওয়ার নয়, তখন তাঁরই ত' এই করুণা।" যদি এই বিচারে আমরা সুদৃঢ় হতে পারি, তবেই আমরা শীঘ্র মায়ার কবল থেকে মুক্তি পাব।

আর তার সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতাও জানাতে হবে। "হে প্রভো! তুমি কত দয়ালু! তুমি এত কম সময়েই আমাকে আমার পূর্ব দুষ্কৃতি থেকে এত সহজেই মুক্ত করে দিলে! তোমার এত দয়া! তোমাকে প্রণাম জানাই। আমি হয়ত নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপরাশির ফল ভোগ করতে করতে কত জন্ম-জন্মান্তরই কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি ত' মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার শেষ করে দিলে। তোমাকে আবার প্রণাম জানাই"—এই রকম বিচারের দ্বারাই সাধক খুব শীঘ্র নিজের কর্মফল শেষ করে ফেলে। এইটাই ত' সিদ্ধির চাবিকাঠি।

প্রশ্ন ঃ গুরু যখন শাসন করেন, তখন শিষ্যের কি বিচার হবে? তা যে তার মঙ্গলের জন্যই—এই মনোভাবই কি তার রাখা দরকার?

শ্রীল মহারাজ ঃ হাঁ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, গুরু যখন শিষ্যকে শাসন করেন, তখন তিনি তাকে নিজের বলেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। এতে তাঁর স্নেহের আধিক্যই প্রমাণ করে। কিন্তু যখন তিনি উদাসীনতা দেখান, শিষ্যের দোষ-ত্রুটি দেখেও নীরবতা অবলম্বন করেন, তখন বুঝতে হবে, তিনি শিষ্যকে দূরে রেখেছেন। শ্রীগুরুর শাসন ত' মহাসৌভাগ্যের কথা! তাতে এই বিচার হবে—শ্রীগুরুদেবের সন্ধানী চোখ ত' সর্বদাই আমার উপর রয়েছে। আমার মধ্যে এতটুকু ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারছেন না।" এ রকম সৌভাগ্য ক'জনের হয়? তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই আমার উপর রয়েছে, যাতে কোন দোষ ত্রুটি আমার মধ্যে এসে আমাকে কৃষ্ণসেবা থেকে বিচ্যুত না করে। তাঁর দৃষ্টি সব সময় আছে। তাঁর শাসন থেকে এই ত' বুঝা যায়। এত খুবই সৌভাগ্যের কথা। শ্রীশিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভগবানের প্রতি ভক্তের আসক্তি কি প্রকার হওয়া দরকার তা বলে দিয়েছেন। তবে সেখানে যদিও কৃষ্ণের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তাতে আমরা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে সেই প্রকার সম্বন্ধ ধরে নিতে পারি।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমাম্
অদর্শনা মর্মাহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আদরই করুণ বা আমাকে ঠেলে দিয়ে মাড়িয়ে যান, আমি তাঁর পাদপদ্মই ধরে রাখবো। আর এও হতে পারে তিনি আমার প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন, আমাকে শাসনও করেন না, আমাকে গ্রাহ্যই করেন না। আমি তাঁর কাছে কিছুই নই, তিনি আমাকে তাঁর নিজ জনের মধ্যে একজন বলে গণ্য করেন না। আমি তাঁর কাছে যে স্নেহ আশা করতাম, আমার চোখের সামনে দেখি, অন্যেরা সে স্নেহ উপভোগ করছে। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত বিপদ্জনক হলে ও আমার তো আর অন্য কোন গতি নাই, তাঁর পাদপদ্ম ছাড়া। কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব।

এই রকম বিচার ধারা গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের বেলায়ও প্রযোজ্য। গুরুদেব আমাকে শাসনই করুন আর উদাসীনই হন, তিনি যে কোনো ভাবই দেখান, তাঁর আশ্রয় ছাড়া আমার আর কোনো গতিই নাই। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এই রকমই হওয়া চাই। এই সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও নিত্য। এ সম্বন্ধ ছিন্ন করার কথা চিন্তা করতে পারা যায় না, এর বাইরে কিছু তাও ভেবে পারা যায় না। আমরা যখন নিত্য ধামে যেতে চাই, তখন এই সম্বন্ধটা তো নিত্য হওয়া চাই। সসীম চাইছে অসীমের সংগে সম্বন্ধ একি এতো ছোট ব্যাপার? এই সম্পর্কের নিত্যতার কথা যদিও অচিন্ত্য, তথাপি অচিন্তনীয় রূপে সত্য। এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপরই আমার যাবতীয় সাধন সত্তা নির্ভর করছে।

আমার পৃথক সত্তা অসম্ভব। কারণ তাতো স্বতঃসিদ্ধ; আমার স্বরূপেই আছে। কেবল আমি তা ভুলে গেছি, এইমাত্র। আর এইটাই যতো দুঃখের কারণ। আর এই বিস্মৃতির প্রকার ও পরিমাণের দরুণ সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যায় এই ভুল বোঝাটাই যতো দুঃখের কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সর্বাত্ম সমর্পণে চরম লাভ

শ্রীল মহারাজ ঃ নিঃস্বার্থতার অর্থই হল "শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর, সব কিছু"—এই সত্যটিকে মেনে নেওয়া। তাই তাঁর ইচ্ছা হলে সব সত্তাই লোপ পেয়ে যেতে পারে। আত্মা নিত্য, একথা যদিও আমরা শুনেছি, তবুও একথাও সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্বোপরি এবং তিনি ইচ্ছা করলে আমার আত্মসত্তাও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মালিক ভৃত্যকে মেরে ফেলতেও পারে। 'মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা/নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা'—You can keep me or you can do away with me. তুমি আমাকে রাখতেও পার, মারতেও পার এটা ত' তোমার constitutional right—সাংবিধানিক অধিকার। আমি ত' তোমারই পুরোপুরি অধীন। তুমি আমাকে মারতেও পার, তারতেও পার, যা ইচ্ছা তা করতে পার। তুমি যতোই নিজেকে অসহায় বলে অনুভব করবে ততোই তুমি বাস্তবতার দিক থেকে নিজেকে লাভবান করতে পারবে, আর সে জগতে তোমার একটা নিজের স্থিতি বা অধিকার লাভ করবে। অহংকারের সেখানে স্থান নাই, বরং ঠিক তার উল্টোটাই দরকার, আর তা হলো full humility বা পরিপূর্ণ বিনয়। আর এই রকম নম্রতা বা দৈন্যই সেখানে দরকার ; কারণ তোমার কিছু নাই এই চিন্তাই আসল কথা। আমার কিছু আছে এ চিন্তাতো আদৌ নয়। সে জগতে তাঁর কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।"

শক্তি বা নারীর গুরুত্ব আছে সত্যি কিন্তু তা একটা বিশেষ বিচারের দিক থেকে। পুরুষের অধিকারকে নারী অনুকরণ করবে এটা ঠিক নয় কারণ তাতে সে তো হেরেই যাবে। সেই রকম পুরুষের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে পুরুষ Predominating বা বশকারী, আর নারী হলো বশ্য। যদি আমরা বশকারীর ভূমিকা গ্রহণ করি, তা হলে আমরা মায়ার সংস্পর্শে এসে পড়বো আর তার ফলে আমরা হয়ে যাব পুরুষ বা ভোক্তা। [illegible] যদি আমরা অপ্রাকৃত জগতে যেতে চাই, তা হলে আমাদের [illegible]

চলবে না ; আমাদের নারীই হতে হবে বশ্য বা শক্তি জাতীয় হতে হবে। যেখানে কৃষ্ণের সম্পর্কের কথা, সেখানে আমরা শক্তি, আর যেখানে মায়ার সম্পর্কের কথা সেখানে আমরা শক্তিমান বা পুরুষ।

মায়ার জগতে আমরা শোষণকারী বা ভোক্তা, আর কৃষ্ণের জগতে আমরা ভোগ্যা। পরজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে আমাদের ভোগ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের 'চালক' বুদ্ধি ছেড়ে 'চালিত' জ্ঞানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা মায়ার জগতে এসে পড়েছি, তাই 'ভোক্তা' সেজে তার কুফল ভোগই করছি। মায়ার জগতে আমরা 'পুরুষ' সেজে বসে আছি। কিন্তু কৃষ্ণের জগতে আমরা পুরুষ নই, ভোক্তা নাই। আমরা শক্তি বা ভোগ্যা। তাই আমরা যতটা নিজের আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব, ততটাই সে জগতের দিকে অগ্রসর হতে পারব। সে জগতে প্রবেশ করার প্রাথমিক সোপান হল—'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'। কেবল শরণাগত হলেই আমরা সে জগতে প্রবেশপত্র পাব, তা না হলে কিছুই হবে না। সেবা Service হল 'তুমি নিজেকে তাঁর হাতের পুতুল করে ছেড়ে দেওয়া'। তুমি যতটা নিজেকে তাঁর হাতে ছেড়ে দেবে, ততটাই সে জগতে প্রবেশ করতে পারবে। সে জগতে exploitation এর স্থান নাই—পরমাত্মার জগতে ত' নাইই, আর কৃষ্ণের ধামের ত' কথাই নাই।

প্রশ্ন ঃ মায়াবাদী এবং নির্বিশেষবাদীরা যে জ্ঞানযোগের দ্বারা সেই অসীম তত্ত্বকে জানতে চায়, এ বিচারটা কি প্রকার ?

শ্রীল মহারাজঃ তারা সে ভূমিকায় যেতেই পারে না। তারা এই জড়জগতে ঐ সব যে কুস্তি কসরৎ গুলি দেখায়, তাতে খুব জোর তারা সত্য লোক পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তার পরে আরও কিছু ঐ সাধনা করে তারা ব্রহ্মলোকে মিশে যায়, আর সেইখানেই তাদের সব শেষ হয়ে যায়। তাদের 'সোঽহং'—আমিই সেই পরতত্ত্বের অংশবিশেষ—এই ধারণা

তাদিগকে সেই ব্রহ্মলোকেই রেখে দেয় ; তারা ব্রহ্মলোক ভেদ করে আর এগোতে পারে না, বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু যাদের "দাসোঽহং" আমি সেই পরতত্ত্বের দাস, সেবক, তারা ব্রহ্মলোক পেরিয়ে আরও উচ্চতর লোকের দিকে এগোতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বৈধী ভক্তির সাধকদের সাধনা কি প্রকার হওয়া উচিৎ ?

শ্রীল মহারাজ ঃ তাদের সাধু-গুরু-শাস্ত্র অনুমোদিত পন্থায় সাধন করতে করতে ক্রমশঃ প্রকৃত ভূমিকার যেতে হবে। ঐ ক্রমপন্থায় সাধনার ফলে তারা যতই সাধন ফল পেতে থাকবে, ততই তাদের উৎসাহ বাড়তে থাকবে ; আর সেই অনুপাতে ক্রমোন্নতি হতে থাকবে। ঐ ভাবে রুচির স্তরে পৌঁছালে, সাধুগুরুর কাছ থেকে আরও উন্নততর উপদেশ পাবে এবং সাধন পন্থায় এগোবে। "আপনদশা" পর্যন্ত তাদের সাধন ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। যখন একটা নিশ্চিত ভরসা পাওয়া যাবে তখন 'আপনদশা' self realisation অর্থাৎ স্বরূপ স্ফূর্তি অবস্থা আসবে তখন সাধক এক নূতন আনন্দরস আস্বাদন করতে পারবে, আর তার পতনের সম্ভাবনা থাকবে না।

মুখ্য কথা হল, আমরা সাধন পথে যা কিছু পাই, তা কেবল সেবার দ্বারাই পাওয়া যায়। সেবা, সমর্পণ, দিয়ে যাওয়া ; তবে পাওয়া যায়। আর এই দিয়ে যাওয়ার return প্রতিদান অর্থ বা অন্য কিছু নয়। সেবা করলে সেবাই পাবে, দিলে তার বদলে সেবাই পাবে। যে পরিমাণে নিজেকে দেবে, সেই পরিমাণে পাবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

গীতা ৪।১১

যখন আমি ছাড়া আর কেউ নাই, তখন তারা যখন আমার কাছে জাগতিক কিছু চায়, তা আমাকেই দিতে হয়। কিন্তু তার ত' শেষ আছে ; আবার অভাব হবে। এত একটা খেলা মাত্র। আর যারা serious খুব বুদ্ধিমান্ তারা কেবল আমাকেই চায় ; আর তার বদলে কিছু দিতেই হবে,

তোমার যতটুকু আছে, তা যতই সামান্য হোক না কেন, তার সবটাই দিতে হবে। আমাকে সবটাই দিলে আমাকে পুরোটাই পাবে। যেমন দিবে, তেমন পাবে। তাই যা তোমার আছে, সবটাই নিয়ে এস, তোমার ঐ সামান্য Capital, মূলধন, তাই দাও; আর তার বদলে যা পাবে, তা অনেক, অনেক বেশী।

প্রশ্ন: কিন্তু আমি ত' Bankrupt—একেবারে দেউলে!

শ্রীল মহারাজ: তা ত' ভাল লক্ষণ! যদি এখানে কেউ দেউলে, তা হলে সে ত' আশ্রয় চাইবেই। যদি আন্তরিক দেউলে ভাব হয়, তবে আশ্রয় পাওয়ার ইচ্ছাটাও আন্তরিক হবে।

প্রশ্ন: মহারাজ! আমি আপনার কাছে কিছু ধার চাই।

শ্রীল মহারাজ: ধার! তা এও ত' ধার; আমিও ত ধারে কারবার চালাচ্ছি। আমরা গুরুদেবের কাছ থেকে ধার করেই ত' ব্যবসা চালাচ্ছি! এ গোটা ব্যাপারটাই ধারের ব্যবসা! Negative side, ব্যতিরেক দিক্ থেকে সবই ত' ধারে কারবার!

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৪

যাকে দেখ, তাকে কেবল কৃষ্ণের কথা বল। তাকে মরণের মরুভূমি থেকে বাঁচাও। আমি ত' তোমার পেছনে রয়েছিই। আমি আদেশ করছি কোন ভয় পেও না, গুরু হয়ে যাও, দাতা হয়ে যাও, আর সকলকে দিয়ে যাও এইটিই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ। আর তিনি বলছেন, তিনি পুঁজিপতি, পুঁজিপতি হওয়ার দায়িত্ব তো তাই।

মায়িক জগতে আমি ক্ষুদ্র, এই সত্যটাকে হজম করা ভারী কঠিন। এই সত্যটিকে মেনে নিতে আমাদের খুবই অরুচি, আর এইটিইতো রোগ।

আমাদের ভেতরের প্রবৃত্তিটাই হলো অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি তা তো আমাদের বোঝা দরকার। এখানে আমরা চারদিক থেকে কেবল অপরের স্বাধীনতাকেই ছিনিয়ে নিতে অভ্যস্ত। এইটিই হলো আসল ব্যাধি। অপর পক্ষে এর প্রতিক্রিয়া মনোভাব হলো আমি আত্মহত্যা করবো ; তার মানে আমরা কবরে ঢুকে যাই, যাকে বলে সমাধি। যদি আমি অন্যের উপর আমার স্বেচ্ছাচারিতা খাটাতে না পারলাম, তাহলে বরং আমি কবরে গিয়ে ঢুকবো কিন্তু দাসত্ব স্বীকার করবো না। পরিবেশের দাস হওয়া আমার চলবে না। দাস হওয়াকে আমরা ভয় পাই, দাসত্ব আমি চাই না, আমি চাই প্রভুত্ব, আর কারো হাতে আমার স্বাধীনতাটা দিয়ে দেবো এ চলবে না। এইটাই গোড়ায় গলদ। স্বাধীনতার অর্থ আমরা বুঝি পরিবেশের উপর অধিকার সাব্যস্ত করা। কিন্তু পরিবেশের সেবা করার মনোবৃত্তিটা আমরা গ্রহণ করিনা কেন, কারণ তাতে আমরা ভেবেনিই, আমরা একেবারে ছোট হয়ে যাব। কিন্তু অন্যের জন্য কিছু করা, দাস হওয়াতেই ত' আমাদের কল্যাণ! পরিবেশের এবং সর্বোপরি সর্বময় কর্তার সেবা করেই আমরা বাঁচতে পারি, উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা মনে করি, সেবা করলে বুঝি আমরা মরেই যাব। মিথ্যা মনোভাবটা আমাদের মধ্যে জেগে রয়েছে, তা ত' একটা বিজাতীয় মনোবৃত্তি, আর এই বিজাতীয় বৃত্তিটাই আমাদের আত্মাকে ঢেকে দিয়েছে, আমরা একটা তেতো বড়ি গিলে ফেলেছি!

তাই এখন সেবা বলতে কি বোঝায়? হেগেলের দর্শন হচ্ছে, 'die to live' বাঁচার জন্যেই মর। তোমার ego, অহংটাকে এখনই নষ্ট করে ফেল, একেবারে নির্মমভাবে ঝেড়ে দেওয়া। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়, তার পরে তুমি ঠিক বেরিয়ে আসবে আরও উজ্জ্বল হয়ে। তুমি যা আছ, সেই স্থিতিটাকেই নষ্ট করে ফেল, তোমার কল্পিত রূপ, কল্পিত সত্তা সবটাকেই ছেড়ে দাও। ভগবানের নাম নাও, আর মর। "ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল" এখন যা আছ, তা ভুলে যেও, তাতে তোমার আসল সত্তার সন্ধান পাবে—যা মরে না। যেটা মরণশীল, সেটাকে মরতে ছেড়ে

দাও, তার ফলে যা মরে না, সেই সত্তাটাই থেকে যাবে। মহাপ্রভু} সনাতন গোস্বামীকে বললেন,

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটী দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৫৫

যদি কৃষ্ণকে পাই, তবে কোটী দেহ এক মুহূর্তেই ছাড়তে পারি। কিন্তু এই মরাটা কিছুই নয়। এই স্থূল শরীরটা ত' তামসিক, এটা ত্যাগ করাটা ত' খুব একটা বড় রকমের ত্যাগ নয়। মরা মানেই একেবারে মরা, যাকে বলে আসল মৃত্যু, তাইই দরকার। এই দেহে আত্মবুদ্ধিই পশুবুদ্ধি, তা ছাড়তে পারলে তবে কেবল 'তটস্থ' অবস্থায় পৌঁছাতে পারি। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, মর আর নাই মর, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই। সেই আন্তর সম্পদ, আত্মসত্তা বা কৃষ্ণদাস্য পাওয়ার জন্য যে কোন উপায় সম্ভব ধরে নাও।

এই আসল capital, পুঁজি, তা কেবল সাধুসঙ্গেই, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তা যে ভাবে হোক, যে কোন মূল্য দিয়েই হোক, কিনে নাও। সেই উন্নত ভূমিকায় পৌঁছাতে হলে কেবল স্থূল দেহ বা সূক্ষ্মমনের মৃত্যুতেই কুলোবে না। কৃষ্ণের connection, সম্বন্ধ পেতে গেলে সমগ্র সত্তা দিয়েই পেতে হবে। যেমন জিনিষ চাইবে, তার জন্য দামও তেমন দিতে হবে। তোমার ভেতরের যে সূক্ষ্মবৃত্তি, ভালবাসা বা প্রেম রয়েছে, তাকে পুরোপুরি কৃষ্ণকে দিয়ে দিতে হবে, তবেই কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাবে। স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তা ত' অনেক আছে; যেমন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য। স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে এই রকম কত আবরণ রয়েছে—বিরজা, ব্রহ্মলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত কত সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম আবরণ ভেদ করতে হবে। আর সবচেয়ে সূক্ষ্মতম যে স্বরূপটি, তা কেবল কৃষ্ণচেতনাতেই পাওয়া সম্ভব এবং তা পেতে হলে সর্বাত্মনিবেদন—dedicatioh to the highest capacity, আর সেই dedication কেবল সেই

সর্বনিয়ন্তা Autocrat কৃষ্ণকেই। শ্রীকৃষ্ণ কোন justice বা ন্যায় দেওয়ার কর্ত্তা Constitutional king নন। তিনি স্বেচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছাই সব। সেই ইচ্ছার কাছে নিজেকে পুরোপুরি দিয়ে দিতে হবে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করুন। আমাকে চরম ত্যাগ করতেই হবে, আর তাতে পাওয়া হবে, লাভও হবে সর্বোত্তম। Risk যত বেশী নেওয়া হবে লাভও তত বেশী হবে। তাই মহাপ্রভু বলেন—"কৃপণ হইও না; সেই Autocrat স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণের কাছে সব দিয়ে দাও, তার বদলে সবটাই পাবে"। তাই হিসাব নিকাশ করো না, কৃপণতা করো না। যদি ঠিক যায়গাটা পেয়ে থাক, তবে পুরোপুরি সমর্পণ, আত্মনিক্ষেপ করে দাও। আমরা সেবা করবার জন্য ঠিক যায়গায় এসে পড়েছি। নিলাম ধরবার জন্য সবচেয়ে highest bidder ত' কৃষ্ণ নিজেই কেউই ওঁর দরকে টপ্‌কে যাবে না। তবে সে ব্যক্তিটি অত্যন্ত খামখেয়ালী। ধনী যেমন, আর অমিতব্যয়ীও তেমন। সে কেবল একটাই চায়—ভালবাসা, প্রেম, নিষ্কাম প্রেম।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ, আমাকে কেবল ভক্তির দ্বারাই পেতে পার, আর কোন কিছুর দ্বারা আমাকে পাওয়া যাবে না। আর কোন পথই আমার কাছে নিয়ে যেতে পারে না।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধোর্দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম্॥

গীতা ১১।৫৩

ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধন দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতির জগতে যা সব পাওয়া যায়, তাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিনা। আমরা এর চেয়ে কোন উন্নত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য এখানে এসেছি—আর তা' খুবই দুর্ল্লভ হোলেও বাস্তব। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা ব ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

গীতা ২।৩৭

যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গলাভ, আর জয়লাভ করলে পৃথিবী ভোগ করবে। হে অর্জুন! তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে, এই দৃঢ়তা নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ ত্যাগ করা ত' সর্বনাশের ব্যাপার।

আমাদের এই যাত্রাটাই ত' সেই রকম দুঃসাহসের ব্যাপার। যদি আমরা সফল হই, তবে ত' সব চেয়ে সেরা জিনিষটাই পেয়ে যাব, আর যদি হেরে যাই, তবে ত' সব শেষ, সারা জীবনটাই মাটি। এই রকম risk নিয়েই ত' আমরা সব চেয়ে মূল্যবান বস্তুর সন্ধানে নেমেছি। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং ফেরার কথা চিন্তাই করব না। আমরা তাঁর সন্ধান করতে করতে কেবল এগোব। কারণ তাকে যদি জানতে পারি তবে সবই জানা হয়ে গেল। এই প্রলোভন পেয়েই ত' আমরা এ পথে পা দিয়েছি,—

যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।

সবকিছুর গোড়ার কথাটা কি তাই জানতে চেষ্টা করে। তা'হলে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে সবকিছুই এসে যাবে, কৃষ্ণানুসন্ধানে, search for Srikrishna, কৃষ্ণেরই অনুসন্ধান কর। ঐ ব্রহ্ম পরমাত্মা এসব আবার কি? কৃষ্ণই তো সব কিছুর সার, কৃষ্ণ-চেতনাই দরকার। সব কিছুই তো কৃষ্ণেরই, সেই কৃষ্ণের অনুসন্ধান করো। কৃষ্ণ এরকমই সে একটা স্বেচ্ছাচারী, চোর, আর শঠ। মহাপ্রভু একদিন নবদ্বীপে গোপী গোপী বলে চিৎকার করছিলেন। সেকালে একজন পড়ুয়া তাতে আপত্তি করে বলতে লাগল, "ও নিমাই পণ্ডিত, তুমি গোপী গোপী করে চিৎকার করছো কেন? এতো কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। বরং কৃষ্ণ নাম করো। কৃষ্ণ নাম করলে তোমার মঙ্গল হবে, এ রকমই তো শাস্ত্রের কথা। তুমি কৃষ্ণ নাম না করে গোপী গোপী বলছ কেন? তুমি কি পাগল? এতে কেবল বৃথা সময়

নষ্ট করছো। তুমি তো খুব বড়ো জ্ঞানী, তোমার আবার এই অধঃপতন কেন ?”

মহাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, কৃষ্ণের নাম আবার কেউ নেয় ? সে তো একটা প্রতারক, দেখ গোপীদের সঙ্গে সে কেমন প্রতারণা করেছে! তাঁরা এতো ভালোবাসা নিয়ে তাঁর কাছে এলো, কিন্তু তিনি তাঁদের কাঁদিয়ে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ওর নাম কে নেবে ? আর তুমি এসেছো তাঁর হয়ে আমাকে বলতে! দাঁড়াও তোমাকে দেখছি। এই বলে মহাপ্রভু লাঠি নিয়ে তাকে মারতে দৌড়ালেন।

ও লোকটা ভাবলো, নিমাই পণ্ডিত একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে, একেবারে গোল্লায় গেছে, এই বলে সে দৌড়ে পালাল। তার দলে গিয়ে বললো, নিমাই পণ্ডিত আমাকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছিল তাঁকে আমরা সকলে মিলে উচিত শিক্ষা দেবোই।

মহাপ্রভুর কথা হলো, কৃষ্ণের নাম নিয়োনা সে ভারি নিষ্ঠুর, প্রতারক। সে সেবকদের আশা দিয়ে ছেড়ে পালায়। তাই তাঁর সেবায় কাজ নাই বরং আমরা গোপী নাম জপ করি, কারণ তাঁরা কেবল দিতেই জানে, তাঁরা আসতে জানে, ফিরে যেতে জানে না। আমরা তাদেরই পূজা করবো।

গোপীদের শ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। নিজেকে দিয়ে দেওয়া, সমর্পণ করার ব্যাপারে তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠা, তাঁর কাছে কেবল ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্য কেউই দাঁড়াতে পারে না। তিনি মহাভাব স্বরূপিণী। ত্যাগের চরমসীমা তাঁতেই আছে। এমন ত্যাগ, এমন আত্ম-সমর্পণ, এমন শরণাগতি আর কারও মধ্যে দেখা যায় না। কোন শাস্ত্রেও তাঁর নজির পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট লক্ষ্মীদেবীরও স্থান নাই। সেই রকম নারায়ণও রাধারাণীর কাছে যেতে পারেন না। অন্যের কিবা, স্বয়ং দ্বারকেশ, মথুরেশ এমন কি গোপেশও নয়। রাসনৃত্যের সময় আপাততঃ মনে হয়, সব গোপীই সমান,

কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর মধ্যে একটু রমণীয় ঈর্ষা জেগে গেল। তাই তিনি নৃত্য-গীতে তাঁর উৎকর্ষ দেখিয়ে দিয়েই হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলেন। সব গোপীকে জয় করে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ একাকী হয়ে গেলেন, চতুর্দিকে শূন্য দেখলেন। তাঁর সমগ্র সত্তার মূল উৎস যখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন তিনি একেবার শূন্য, নিঃশেষ হয়ে গেলেন। তিনি চারিদিকে খুঁজেও রাধারাণীকে কোথায়ও পেলেন না, তাই তিনিও লুকিয়ে সব গোপীদের ছেড়ে রাধারাণীকে খুঁজবার জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী", শ্রীজয়দেব বলেন, একদিকে সব গোপী, আর একদিকে রাধারাণী; সকলের চেয়ে তাঁরই ওজন বেশী। শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে বাদ দিয়ে একমাত্র শ্রীরাধারাণীর খোঁজে চলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায়রামানন্দের সংলাপেও স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে,সেবার গুণগত তারতম্য দেখতে গেলে শ্রীরাধারাণীর প্রেমসেবা আর অন্য গোপীদের সেবার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আমি একটি শ্লোকে দেখিয়ে দিয়েছি যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেবল রাধারাণীই বিরাজমানা এবং তিনিই সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের কেন্দ্রবিন্দু।

যদমীয়মহিমা শ্রীভাগবত্যঃ কথায়াং
প্রতিপদ মনুভূতং চাপ্যলভ্যাভিধেয়।
তদখিল রসমূর্ত্তি শ্যামলীলাবলম্বং
মধুররসধিরাধাপাদপদ্মং প্রপদ্যে॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে যত ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে যত ভক্তি মূলক আখ্যান বলা হয়েছে, সে সমস্ত দ্বারাই শ্রীরাধারাণীকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাধাদাস্য প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য আর অন্যান্য যা কিছু আলোচনা, সে সবই কেবল সেই রাধাদাস্য সিদ্ধান্তের প্রস্তুতিপর্ব।

অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে কোথাও শ্রীরাধার নামোল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি পদই শ্রীরাধার মহিমা প্রতিপাদন করাতে পর্য্যবসিত, তাই স্পষ্টভাবে তাঁর নামোল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি, আর শ্রীরাধা সেই অখিল রসামৃত মূর্তির আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীশ্যামের লীলার আশ্রয়ই শ্রীরাধা। তিনি মধুররসের মূল উৎস। অখিল-রসামৃত মূর্ত্তির একমাত্র জীবাতু, সমগ্র রসের নির্য্যাস সেই শ্রীরাধারাণীর পাদ পদ্ম আমি বন্দনা করি। সমগ্র রসের আকর কৃষ্ণ এবং সেই কৃষ্ণের পরম আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার পাদপদ্মের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

—×—

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিরক্ষক এবং তাঁর নিত্যসেবক

লেখক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিআনন্দ সাগর

গুর্বাভীষ্টসুপূরকং গুরুগণৈরাশিষ সম্ভূষিতং

চিন্ত্যাচিন্ত্যসমস্তবেদ নিপুণংশ্রীরূপপন্থানুগম্ ।

গোবিন্দাভিধমুজ্জ্বলং বরতনুং ভক্ত্যান্বিতং সুন্দরং

বন্দে বিশ্বগুরুঞ্চ দিব্যভগবৎপ্রেমণো হি বীজপ্রদম্ ॥

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরম্ ।

শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল শ্রীধরস্বামিনং সদা ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিন্যাসিচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বর্দ্ধমানের হাপানিয়া গ্রামে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে যুগের স্থানীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয় এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী গৌরীদেবী, উভয়েই ঐকান্তিক হরিভক্তি পরায়ণ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁদেরই পুত্রত্ব স্বীকার করে আবির্ভাব লীলা প্রকট করেছিলেন। তাঁরা নিজের প্রিয়তম পুত্রের নাম রেখেছিলেন রামেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীল গুরুমহারাজ কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করে ল' পড়তে পড়তে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১নং উল্টাডিঙ্গী জংশন্ রোডস্থিত গৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার অল্পদিন পরেই ১৯২৬ খ্রীষ্টব্দে শ্রীল গুরুমহারাজ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে গৌড়ীয়মিশনে যোগদান করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম সংকীর্ত্তনে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। বর্ত্তমান সেই আকর্ষণের পুর্ণপরিপ্রকাশ হল শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজরূপে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর মধ্যে গভীর পরিপক্ক শাস্ত্রজ্ঞান এবং তাঁর অন্তর্নিহিত মহাভাগবতোত্তম লক্ষণ দর্শন করে তাঁর 'ভক্তিরক্ষক' এই সার্থক নাম প্রদান করেছিলেন। তিনি যে যথার্থই 'ভক্তি-রক্ষক', তা আরও দৃঢ়তররূপে প্রতিপাদিত হয়েছিল, যেদিন তিনি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রত্যক্ষপ্রেরণায় 'শ্রীভক্তিবিনোদ বিরহ-দশকম্' শীর্ষক সংস্কৃত

শ্লোকাবলী রচনা করে প্রকাশ করে, তাঁর শ্রীগুরুদেবের পূর্ণতৃপ্তি বিধান করেন।

শ্রীল শ্রীধর মহারাজ সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহু শাখামঠ প্রতিষ্ঠা, মিশনের সংগঠন এবং হরিকথা প্রচারে একজন প্রধান স্তম্ভের অন্যতমরূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছিলেন। শ্রীল সরস্বতীঠাকুর তাঁর অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের সময় শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের জীবাতু—একান্ত মর্মস্পর্শি প্রার্থনা 'শ্রীরূপমঞ্জরী পদ' এই প্রার্থনাটি গান করতে বলেছিলেন, তাতেই শ্রীল মহারাজের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ এবং প্রীতি কত যে গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। শ্রীল মহারাজ প্রকৃতই যে 'ভক্তিরক্ষক' এবং তিনি ভবিষ্যতে শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের ভাবী আচার্য্য রূপে গুরু-গৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচারে নেতৃত্ব নেবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরে যে নিশ্চিতরূপে ছিল তারও প্রমাণ ও ইঙ্গিত ঐ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল শ্রীধর মহারাজের সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় অজস্র ভক্তি-কাব্য সৃষ্টি এবং তাঁর প্রকাশিত অসংখ্য ব্যাখ্যা বিবৃতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টকে সার্থক রূপদান করেছে।

শ্রীল মহারাজের প্রকটকালের শেষ পর্য্যায়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শতশত শিষ্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণ প্রান্তে এসে তাঁর সাধন-ভজন সম্পর্কীয় উপদেশ এবং হরিকথা শ্রবণ করে যে সব টেপ-রেকর্ড করে নিয়েছিলেন সেগুলি থেকে বহু ইংরাজী পুস্তক মুদ্রিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ভক্ত পিপাসু জনগণের ভক্তি অণুশীলনের সুযোগ প্রদান করেছে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে নিজের শিক্ষাগুরু রূপে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় শ্রীল গুরু মহারাজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর বহু বিদেশী ভক্ত তাঁর পাদপদ্মে সমবেত হয়ে তাঁকে শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

তাঁর নিত্য সেবক

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ মহারাজ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরমাসের ১৭ তরিখে শ্রীপাট হাপানিয়া থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে বর্দ্ধমান জেলার—ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে (মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে) শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী দিবসে শ্রীল গুরুমহারাজের পাদপদ্মে আগমন করেন। আমার মত যারা শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রবণের সৌভাগ্য পেয়েছেন

তাঁরা জানেন যে, শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল গোবিন্দ মহারাজের প্রতি কতটা অকৃত্রিম প্রীতি ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ অনবরত বর্ষণ করেছিলেন এবং এখন ও তার নিত্য লীলাস্থলী থেকে বর্ষণ করে চলেছেন।

যখন ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট, অমাবস্যা দিবসে শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁর প্রিয়তম ভজনস্থলী শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে সমাধিস্থ হলেন, তখন ভক্তগণ অনুভব করলেন যদিও শ্রীল গুরু মহারাজ সকলের চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তথাপি শ্রীল গুরু মহারাজ ভক্তদের জন্য সেবার ধারা যে, অচ্ছেদ্য রূপে প্রবাহিত হওয়া দরকার তা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্য তার অপ্রকটের তিন বৎসর আগেই শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী সেবায়েত আচার্য্য এবং পথ প্রদর্শক আলোক বর্ত্তিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন যাতে শ্রীরূপানুগ ধারায় কখনও ছেদ না পড়ে।

এই ধারার আচার্য্যবর্গ প্রভাদীপ্ত সমুজ্জ্বল সূর্য্যের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন সেই সুর্য্যের কিরণরেখা, যার দ্বারা বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম, সব সৃষ্টিই প্রাণধারণ করে, পুষ্টিলাভ করে। তাঁরাই অপ্রাকৃতকৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা (দিব্য ভগবৎপ্রেম্ণো হি বীজপ্রদম্)। শ্রীল গুরুমহারাজের যাঁরা একান্ত প্রিয় অনুগতজন, তাঁরা শ্রীগৌড়ীয় গুরু-পরম্পরায় শ্রীল গুরুমহারাজের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী আচার্য্যরূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজকে পেয়ে অন্তরে উল্লসিত হয়েছেন। শ্রীল গুরুমহারাজ নিজেই তাঁর পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর Last will and Testament-এ নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন। তাঁর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম will এ তিনি যে শ্রীল গোবিন্দ মহারাজকেই তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করবেন, তাঁর একবার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। তার পরে তিনি যতগুলি will করেছেন, সবটাতেই তাঁর ঐ উত্তরাধিকারী নির্বাচনে কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই ইচ্ছার আইনগত দিক ছাড়াও, পরমার্থের দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রীল গুরুমহাজের নিকটতম ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯৪৭ সালে শ্রীল গোবিন্দ মহারাজ যখন প্রথমে তাঁর চরণাশ্রয়ে আসেন, তখন শ্রীল মহারাজ একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, "ইনিই হবেন আমার উত্তরাধিকারী"। শ্রীল গুরু মহারাজের যে সমস্ত সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা তাঁকে বিশেষ, শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, তাঁরাও তা

শুনে ভাবী আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দ মহারাজের প্রতি বিশেষ স্নেহকৃপা প্রদর্শন করতেন (গুরুগণৈরাশিষ সম্ভূষিতম্)।

শ্রীল গোবিন্দ মহারাজ তাঁর গুরুদেবের মতই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি এর মধ্যেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহু প্রার্থনা ও গানের পদাবলী রচনা করে আমাদের ভক্তিপিপাসার উপাদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। তা ছাড়া তাঁর মধুঝরা কণ্ঠথেকে নিঃসৃত হরিকথামৃত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পুরণের জন্য অক্লান্ত উদ্যম, প্রথম থেকেই আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ও বিশ্বব্যাপী মঠ ও সংঘারামের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অভিবৃদ্ধির জন্য তিনি যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তা যে তিনি ব্যতীত আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না, এ সত্য সকলেই অন্তরে স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে শ্রীসমাধিমন্দিরের অনন্য সাধারণ পরিকল্পনা এবং তার বাস্তব রূপায়ণ যে কত চমৎকার হয়েছে, তা কেবল তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, এত সকলেই স্থূলচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন (গুর্বাভীষ্ট সুপূরকম্)।

আমার আন্তরিক প্রার্থনা, এই 'Sermons of the Guardian of Devotion' এর মত আরও অনেক ভক্তিগ্রন্থ ভবিষ্যতে তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হবে এবং এটি আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—শ্রীল গুরু মহারাজ ও শ্রীল গোবিন্দ মহারাজের চিত্তপ্রসাদনী হরিকথামৃত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে। এই কামনা করে আমি পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ এবং তাঁর একান্ত নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

— x —

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে প্রাপ্তব্য
ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম
অমৃতবিদ্যা (বাংলা ও উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক

The Search for Sri Krishna : Reality the Beautiful
(Eng., Spanish, Hungari, Itali & Swedish)
Sri Guru and His Grace (English, Spanish)
The Golden Volcano of Divine Love
Bhagavad Gita : The Hidden Treasure of
The Sweet Absolute
Loving Search for the Lost Servant (Eng., Spanish)
Positive & Progressive Immortality
(Prapanna Jivanamritam)
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol. I. II. III & IV)
Subjective Evolution
The Mahamantra

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত
ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
The Divine Servitor
The Bhagvata

"জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি কবলিত এই জাগতিক স্থিতিতে যে আমি সন্তুষ্ট নই, এই অনুভব আমার হওয়া দরকার। যদি কেউ প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করতে চায়, তা হলে এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রযত্ন করতে হবে আর একটি ঘরে ফিরে যাবার জন্য, ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য। আর আমরা প্রাচীন কাল থেকেই শুনে আসছি যে, আমাদের জন্য আর একটি বাসস্থান আছে, তা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পদছায়া। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এমন একটি কর্মসূচী তৈরী করে নেব, যাতে করে আমরা এই কুৎসিৎ বাসস্থান ছেড়ে আমাদের **Sweet Home**, সুখের ঘরে চলে যেতে পারি। আর এই অনুভূতিটাকে পাগলামি বলা চলে না। সুখের সন্ধানে চেষ্টা করা বৃথা নয়, অযৌক্তিক নয়, বরং এইটাই সবচেয়ে বেশী যুক্তিসম্মত।"

—শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী